কামকানন

নির্মলেন্দু গুণ

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য; বাংলা অভিধানে এই ষড়রিপুকে দুষ্টপ্রবৃত্তি বলে মনে করা হয়েছে। অন্য পঞ্চরিপু বিষয়ে আমার বিবেচনা অভিধানসম্মত, কিন্তু কামকে আমি দুষ্টপ্রবৃত্তি বলে ভাবতে পারি না। বাংলাভাষার বহু শ্রুতিমধুর শব্দের উৎস হচ্ছে কাম। যেমন কামেশ্বর বা কামেশ্বরী, যেখানে কামের সঙ্গে আমাদের ঈশ্বর-ঈশ্বরীরাও যুক্ত হয়েছেন। আমরা পেয়েছি কামদেব, মদনশরবিদ্ধ রতিদেবী, বাৎস্যায়ন বিরচিত কামশাস্ত্র, কামের চৌষট্টিকলা ও রমণের ষোড়শ-শয়নভেদ বা রতিবন্ধজ্ঞান।

প্রাণের উৎস যেখানে কাম, সেখানে আমি কীভাবে তাকে দুষ্টপ্রবৃত্তি বলি? আমার আনন্দযৌবনলগ্ন শুরুর মুহূর্ত থেকে এই প্রশ্ন আমাকে আন্দোলিত করেছে; আমার প্রাণ, আমার ধ্যান ধাবিত হয়েছে তার পানে। আমি কামের আনন্দ উপলব্ধি করেছি, মনে হয়েছে, হয়তো এই কথাটা সানন্দে জানান দেবার জন্যই আমি কবি। অন্যথায় রবিকরোজ্জ্বল বাংলা-কবিতায় আমার মৌলিকত্ব আর কোথায়?

আমি আমার কবিতায় মানবজাতির চালিকাশক্তিকে ষড়রিপুর নিন্দাতালিকা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছি; কামের শিল্পভাষ্য রচনা ক'রে মানবপ্রকৃতির এই ঐশ্বর্যকে করতে চেয়েছি মহিমান্বিত। বাংলা কবিতার প্রাজ্ঞ পাঠকরাই বলবেন, এই কবিতাগুলোর প্রয়োজন ছিল কি না!

প্রার্থনা করি কামকাননের পুষ্পগন্ধ ও মধুমদে মধুময় হোক মানব-মানবীর জীবন।

কবিতাগুলোর রচনাকাল : ১৯৭০-২০০৬

ISBN : 984 410 545 5

আলোকচিত্র শফিউল আলম সুমন

জন্ম ২১ জুন ১৯৪৫, ৭ আষাঢ় ১৩৫২ বৃহস্পতিবার
জেলা নেত্রকোণা
শিক্ষা বিএ ১৯৬৯
প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রেমাংশুর রক্ত চাই, নভেম্বর ১৯৭০।
এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ কমবেশি ৮০টি।
সম্প্রতি তাঁর রচনাবলী ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।
আত্মজীবনী আমার ছেলেবেলা ও আমার কণ্ঠস্বর।
ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নির্বাচিত
কবিতার সংকলন
Selected Poems of
Nrimalendu Goon
রাষ্ট্রীয় একুশে পদক ও বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ
বাংলাদেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার লাভ
করেছেন। ভারতের কোলকাতা থেকে পেয়েছেন
উইলিয়াম কেরী লিটারেরি এ্যাওয়ার্ড।
ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়া,
নেপাল, বাহরাইন, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সিঙ্গাপুর,
অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান ভ্রমণ করেছেন।

কামকানন

নির্মলেন্দু গুণ

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৩
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রেস
৩৪ শ্রীশ দাশ লেন ঢাকা ১১০০

দাম
একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 545 5

KAMKANON (A collection of selected poems) by Nirmalendu Gun. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers. 39, Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka One Hundred Forty Only.

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

স্মরণে উৎসর্গিত

'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর,
যিনি পুরুষের সর্বাধিক উপভোগের
স্থূলসমূহ নারীদেহে
ও নারীর পরম তৃপ্তির কারণসমূহ
পুরুষের অঙ্গে ন্যস্ত করিয়াছেন।'

ষোড়শ-শতকের তিউনিশীয় কবি শেখ নেফজাবী
রচিত 'সুগন্ধিকানন' কাব্য থেকে।

অনুসন্ধানপর্ব

ভিতরে তোমার ঘুমাচ্ছে না কে?
ভেবে ভেবে ভোর হয়ে এলো রাত্রি,
এখনও তোমার জানা হল না তা?
অনুসন্ধান করো, অনুসন্ধান করো।

ভিতরে তোমার ঘুমাচ্ছে না কে?
মানবকল্যাণচিন্তা, না কি দেশ?
পরার্থ-বেদনা, না কি অন্যকিছু?
অনুসন্ধান করো, অনুসন্ধান করো।

ভিতরে তোমার ঘুমাচ্ছে না কে?
কষ্টকীর্ণ জীবন যাতনা? সম্পদের
লোভ? —না কি ক্ষমতার মোহ?
অনুসন্ধান করো, অনুসন্ধান করো।

ভিতরে তোমার ঘুমাচ্ছে না কে?
সে কি কৃত-অপকর্মের শোচনা?
হিংসা-ঘৃণা, না কি কৃতীর উল্লাস?
অনুসন্ধান করো, অনুসন্ধান করো।

ভিতরে তোমার ঘুমাচ্ছে না কে?
জীবনবিচ্যুত জড়ের মৌনতা,
না কি সুখ-বুদ্ধি চতুর যৌনতা?
অনুসন্ধান করো, অনুসন্ধান করো।

০১

আনন্দের শ্রেষ্ঠ উৎস হচ্ছে কাম।
কাম থেকে জন্ম নিয়েছেন কবি।

মাঝে-মাঝে আমি ভাবি, ভাবি
আমার কামকুশলতা নিয়ে
এই যে আমি গর্ব করে চলেছি,
আমার কি আদৌ কিছু হচ্ছে?

মুখরা নারীর মুখের নীরব ভাষা,
আমি কি বুঝি না? বুঝি, বুঝি।
তবুও তোমার স্বীকৃতিসুধা বাণী
শুনে সুখী হতে চায় কর্ণযুগল।

ভেবো না হঠাৎ আমি যাদুটোনা ক'রে
বসে গেছি বজ্রভেজা মেঘের চূড়ায়।
জানি কী মারাত্মক ছিল এই খেলা।
তাই আমি চাই তুমি মুখ ফুটে বলো,
আমার কি হয়? আদৌ কিছু হয়?

০২

মনকে ধারণ করে দেহ,
নাকি দেহ মনেরই প্রকাশ?
অমীমাংসিত এই প্রশ্ন নিয়ে
কেটে গেছে হাজার বছর।

দেহ আর মনের বিরোধে
বিক্ষত হয়েছেন বাৎস্যায়ন।

মনকে প্রাধান্য দিয়ে
দেহকে দমন ক'রে ক'রে
আত্মপীড়ন রূপে
পারদর্শিতা হয়েছে অর্জিত।

তারপর উত্তীর্ণ যৌবনে তিনি
জেনেছেন সত্যের সন্ধান,

বুঝেছেন মন বড় সত্য নয়,
মানবের দেহই প্রধান।

জলের মতই মন রঙ বদলায়,
কালে কালে, দেশে দেশে
তার ভিন্ন আচরণ; —কিন্তু
দেহ স্থির, চির পুরাতন সে
গ্যালিলিও সত্যের প্রকাশে।

০৩

চুলায় ভাতের বলক উঠতাছে,
ভাত কিন্তু থকথকা হয়া যাবে ...

হোক, আমি থকথকাই খাবো।

ছাড়েন, মাড় পইড়া যাইতাছে,
ভাত কিন্তু থকথকা হয়া যাবে ...

হোক, তুই আমার কাছে থাক,
আমি থকথকা ভাতই খাবো।

০৪

'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।'
—চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস ছিলেন বড় কবি, কিন্তু
তিনি পাঠ করেন নি বাৎস্যায়ন।
আমি তাঁকে একলব্যের মতোন
খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে করেছি অধ্যয়ন।

তাঁরই কল্যাণে নারীকে চিনেছি,
শিখেছি সঙ্গমকলা, রতিরঙ্গরস;
তা না হলে সকলি গরল ভেল,
কামসিদ্ধি বিনা ব্যর্থ কাব্যায়ন।

০৫

স্তনবৃন্তে গোপনে সজ্জিত ছিল
তনুর অপূর্ব অস্ত্র—;
স্তনপ্রেমী আঁধার রজনী তাকে
ঢেকে রেখেছিল স্বচ্ছ বস্ত্রবৎ।

বুকের বস্ত্র সরিয়ে বাৎস্যায়ন
দেখিলেন তার স্তনবৃন্তের রূপ।
দেখিলেন সেই অপরূপ শোভা,
মনোলোভা, নিদ্রিতা, নিশ্চুপ।

ক্রমশ এ কুচযুগ পরিণত হবে
পয়োধরে, দুগ্ধবতী নারী হয়ে
সন্তানের চাহিদা মিটিয়ে শেষে
ধ্বংসগ্রস্ত হবে সময়ের হাতে।

তবে কি লুট করবার উদ্দেশ্যেই
এরকম যুগল কুসুম নারীদেহে
ফুটিয়েছেন সময়-কামুক ঈশ্বর?

বাৎস্যায়ন স্থির করলেন, তিনি
অনাবৃত স্তনযুগলকে সঙ্গোপনে
আচ্ছাদিত ক'রে ফিরে যাবেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তেই ঘটলো দুর্ঘটনা।
অসতর্ক পুরুষ-আঙুলের
সামান্য আঘাতে বিভাজিত হল
পরমাণু, বিস্ফোরিত হল বোমা।

কুচযুগে ঝাঁপ দিলে কবির সংযম,
ধ্বংসস্তূপ থেকে উত্থিত হলো যম।

০৬

সাদা আকাশ কালো মেঘের ধর্ষণে কম্পিত।

নগরে সে বর্ষা কোথায়? সে ছিল ঐ গ্রামে।
আমি তাকে পেয়েছিলাম জন্মদিনের দামে।

জন্মেছিলাম সাত আষাঢ়ের বর্ষাডাকা ভোরে,
আঁতুড় ঘরে তুষ ভিজেছে উশ্যিলারই তোড়ে।

সে-দাবিতে বলতে পারি, বর্ষা আমার মাতা,
পুত্র দেহে জড়ানো তার ছেঁড়া-শাড়ির কাঁথা।

ঢাকায় যখন বর্ষা খুঁজে তাকাই আকাশ পানে,
শূন্য আকাশ দেখে বুকটা মুচড়ে ওঠে গানে।

বর্ষা ছিলো পাকতে-শুরু ডাঁসা ভুবির স্তনে,
দিন-দুপরে আঁধার করা যোগীশাসন বনে।

বর্ষা ছিল ধান-ডোবানো মাঠ-ভাসানো জলে,
সাঁতার কাঁটা বুনো হাঁসের কামার্ত দঙ্গলে।

তদের কাছেই চিনেছিলাম তেপান্তরের মাঠ,
তারাই আমায় দিয়েছিলো কামশাস্ত্রের পাঠ।

কামকলাতে এই যে আমার একটু বাহাদুরি,
বর্ষাবালার কাছ থেকে তা করেছিলাম চুরি।

শ্রাবণ ঘন গহনমোহে, না জানি সেই প্রিয়া,
কার রজনীগন্ধা হয়ে ফুটেছে, ওফেলিয়া!

নগরে সে বর্ষা কোথায়? সে থাকে ঐ গ্রামে,
জানি তাকে ফিরে পাবো মৃত্যুদিনের দামে।

০৭

যখন অনুমতি ছাড়াই
তোমার ইউরিন-ট্র্যাকে
ঢুকে গেছে ইকোলাই,
তখনও আমাকে তুমি
বসিয়ে রাখবে বাইরে?

তুমি জয় করো দ্বিধা,
জয় করো সংশয়।
মনে রেখো এই দেহ
কমলালেবুর মতো
পচনপ্রবণ, এই দেহ
আর কারও নয়—
তুমি শুধুই তোমার।

আমি চাই তুমি
আমাকে শ্রবণ করো,
আমাকে দ্রবণ করো
তোমার ভিতরে।

বাৎস্যায়ন নন শুধুই
নারীদেহের শিকারি।
ইনি ধন্বন্তরি, কবিরাজ;
কট্টিমের চেয়েও ইনি
দ্রুত উপশমকারী।

রসনার লালাস্রোতে
উনিই সারিয়ে তোলেন
যাত্রা-পথের ক্ষত।
তাঁকে ডাকো, তিনিই
এ-যুগের ভগবান,
তিনিই বাৎস্যায়ন।

এক ডাকে অরণ্যের বাঘও যায় না ছুটে,
আমি যাই, আমি ছুটে যাই; —আমি
কামভিখিরির মত কপর্দকশূন্য করপুটে
তোমার অগ্নির টানে ছুটে যাই, হাওয়া।

রাজৈশ্বর্যের চেয়েও ঢের বেশি মূল্যবান
মণিরত্ন ছিল আমার সুবর্ণ-অর্ণবপোতে।
তোমাকে আবিষ্কার করব বলে, আমার
সমুদ্রজয়ী দেহকে আমি কলম্বাসের মত
ভাসিয়েছিলাম তোমার জলে, কল্পনায়
আমি দুলেছিলাম তোমার জল-স্রোতে।

তুমিই আমার মধ্যে সৃষ্টি করেছ কবিতা,
তুমিই প্রশ্রয়দানে অগ্নিকে করেছ প্রবল,
আমার নশ্বর মনে তুমিই তৈরি করেছো
অমরত্বের তৃষা, -সৃষ্টি করেছো চাওয়া।

তুমি আমার সবচেয়ে বড় সুখের স্মৃতি,
তুমি আমার সবচেয়ে বড় কষ্ট পাওয়া।

০৯

সেই আমাকে অধিক পায়,
যে আমাকে আকাশজুড়ে
মেঘের মতো উড়িতে দেয়।

সেই আমাকে অধিক পায়,
যে আমাকে জলের মতো
ঘূর্ণিপাকে ঘুরিতে দেয়।

সেই আমাকে অধিক পায়,
যে আমাকে কামের চুলায়
কাঠের মতো পুড়িতে দেয়।

সেই আমাকে অধিক পায়,

যে আমাকে নাড়ায় না।
যে আমাকে স্বাধীন রাখে
সে আমাকে হারায় না।

১০

আমার কাছে হাওয়ার চেয়ে
হালকা মনে হয়েছিল টাকা।
তাইতো আমি আকাশ জুড়ে
টাকার ঘুড়ি উড়িয়েছিলাম।

আমার কাছে অগ্নির চেয়েও
উষ্ণ মনে হয়েছিল নারীকে।
তাই আমাকে বরফ-রাতে
নারীর তাতে পুড়িয়েছিলাম।

আমার কাছে লোহার চেয়েও
ভারী মনে হয়েছিল নারীকে,
তবুও তাকে শিবের মতোন
মাথায় তুলে ঘুরিয়েছিলাম।

এখনও আমার কাছে টাকা
উড়ন্ত খৈয়ের মতো ফাঁকা।
এখনও আমার কাছে নারী,
ক্রিকেট বলের মতো ভারী।

১১

রাত্রি কোথায় থাকে? এই নিয়ে আমি
বহু রাতদিন গবেষণা করে কাটিয়েছি।
যখনই কোনো গুণীর সান্নিধ্যে গিয়েছি,
আমি প্রশ্ন করেছি তাকে, 'আপনি কি
বলতে পারেন, রাত্রি কোথায় থাকে?'

সূর্য থেকে আলো আসে, কিন্তু আঁধার?
আকাশে কি একটি কালো সূর্য আছে?

না কবি, না বৈজ্ঞানিক, না দার্শনিক—
আমি কারও কাছেই পাইনি সদুত্তর।
অবশেষে অর্থ-শতাব্দীর সাধনার পর
সম্প্রতি আমি পেয়েছি তার পরিচয়।

রাত্রি হচ্ছে একটি কামার্ত কালো মেয়ে,
সে নদীর ওপারে কামারাঙ্গীর চরে থাকে।
রাত্রি হচ্ছে সেই বিঘোষিতা বহুগামিনী,
ওপারের পুরুষকুলের চাহিদা মিটিয়ে
যে নিয়মিত নদীর এপারে চলে আসে।

অখণ্ড আঁধার ভালোবেসে আমরা তাকে
ধরে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি,
সূর্য-বীর্যে গগন গর্ভবতী হবার আগেই
ঐ বহুগামিনী নদীর ওপারে চলে গেছে।

১২

মানুষকে খুশি করার জন্য
ফুল হয়ে ফোটা ভালো,
এরকম কিছু ভেবে আমি
এই অভয়ারণ্যে ফুটিনি।
আমি পৃথিবীর দুখী ফল,
মানুষের হৃদয়ে ফুটেছি।

সুন্দরকে পান করব বলে
সূর্য ওঠার আগেই
আমি গ্রীষ্মের রোদ হয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম
গৌরী-ঘাসের শিশিরে।

অনিবৃত্ত কামের অগ্নিতে
যখন ডালির জেব্রার মতো
ঝলসে গিয়েছে এই দেহ,
তখন গণিকার পদতলেই

আমি খুঁজে পেয়েছিলাম
আমার বেহেশ্‌ত।

আমি অনুসরণ করেছি,
আমার রক্তের গোত্রকেই।
তাকে প্রাণিজগতের সঙ্গে
মিটেছে আমার বিরোধ।
মানুষকে কখনোই আমার
শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনে হয়নি।
আমি মানুষের চেয়ে বেশি
ভালোবাসি হাঁসের সক্ষম।

১৩

যাকে মধ্যে এ-উত্তীর্ণ যৌবনেও
আমি ঐ কিশোরীর কথা ভাবি,
যাকে দিয়েছি আমার কৈশোর।

যদিও তা ফিরৎ চাই না আমি,
তবু জানি, ঐ হারানো সম্পদ,
আমার মুগ্ধকামের প্রথম কুসুম
ছিল অমূল্য হীরার মতো দামী।

সেদিনের সেই কিশোরী এখন,
গন্ধ হারানো গতযৌবনা নারী।
জীবনানন্দের কবিতার মতোই
এখন সে এক ধূসর পাণ্ডুলিপি।

সমস্ত সঞ্চয়সহ সময়-সাগরে
এখন তাহার ডুবেছে সাম্পান।

প্রকৃতির চঞ্চল গতির প্রবাহে
বস্তুপুঞ্জ যেথা নিত্য ভাসমান,
জানি সেথ বৃথা কালক্ষয়—
অসম্ভব সেথা শরীরী উত্থান।

মানুষের প্রেম, স্বপ্ন-ধন-মান,
কালস্রোতে সবই ভেসে যায়।
তাইতো উজানে হারানো বস্তু
বেলা-শেষে ভাটিতে মিলায়।

কাষ্ঠের সনে পিরিতি করিয়া
কঠিন লোহাও ভাসে জলে;
মহাকালচক্রক্রমে কিশোরীরা
ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে বলে।

নমিত রক্তের অস্তসূর্যভারে
বাৎস্যায়ন ভালবাসে তারে।

১৪

পেছন থেকে আদাব জানিয়ে
সামনে এসে তরুণী বললো :
'দাদা, কিছু মনে করবেন না,
পিছন দিক দিয়া দিলাম।'

আমি চমকে উঠলাম শুনে,
কথাটা সে বুঝে বলছে তো?

ওর তরঙ্গভোলা নিতম্বযুগকে
লুটিয়ে পড়লো আমার দৃষ্টি;
বললাম, 'রাগ করবো কেন?
এটা তো মহব্বতের জিনিস;
এক দিক দিয়া দিলেই হয়।'

মুহূর্তে পাল্টে গেলো দৃশ্যপট,
লজ্জারাঙা তরুণীটি বললো :
'আর যদি আপনেরে দিছি,
আপনি মানুষটা বড় খাকর।'

১৫

আমি মাটি। এতোদিন ব্যাপারটা
নিশ্চিত ছিল না, এখন নিশ্চিত।

আমি মাটি। মাটিই না হবো যদি,
তবে আমার দুই হাতের মুঠোয়
রাতভর এতো কলি ফোটে কেন?

আমি মাটি। মাটিই না হবো যদি,
তবে আমার দুই হাতের মুঠোয়
রাতভর এতো ফুল ফোটে কেন?

দিনে যাই হই, রাতে আমি মাটি।

১৬

তোমার নাভিতে নাক রেখে
আমি যেই পেয়েছি তোমার
জন্মদিনের ঘ্রাণ, সেই থেকে
জানি, একদিন ঐ নাভিতেই
হবে আমার মরণ; তোমার
ঐ নাভিতেই জানি একদিন
নির্মিত হবে আমার শ্মশান।

১৭

পায়ের তলায় নিদ্রিত ছিল মাটি,
অচেতন ভেবে করিনি অধ্যয়ন।
মাঝ রাতে আজ অকস্মাৎহেতু
ভূকম্পনের শিখরে পড়েছে পা,
মাতৃকোষে তাই বিদ্যুৎশিহরন।

পায়ের তলায় নরম ঠেকলো কী?
তুমি কি মাটিতে শুয়েছো ঠাকুরঝি?

বহুদিন এ-মাটিতে ফুটেছে কাঁটা,
লতা গুল্ম, বড়জোর কাঁটাবন,

আজ মনে হলো মাটিতে ফুটেছে
অনাবৃতা নারীর ঘুমানো স্তন।

পায়ের তলায় কোমল ঠেকলো কী?
তুমি কি উদাম শুয়েছো ঠাকুরঝি?

এদ্দিন পলিমাটিতে ফুটেছে ধান,
কচি দুর্বা, কখনওবা মুথা ঘাস;
আজ মনে হলো পায়ের তলায়
অনিদ্রিতার কামার্ত নিঃশ্বাস।

পায়ের তলায় গরম ঠেকলো কী?
তুমি কি সত্যি ঘুমিয়ে ঠাকুরঝি?

কোজাগরী রাতে, পালঙ্কহীন
এই ভূমিশয্যার, দৈবদুর্বিপাকে
রাতভর আমি মাটি ছেনে তাকে
প্রতিমার মতো করেছি নির্মাণ।

নির্মাণ শেষে ছিটিয়ে দিয়েছি ঘি,
তুমি কি আমাকে চিনেছো ঠাকুরঝি?

১৮

যখন আমি নগ্ন হই,
তখনই আমি কবি।

'আইস মলয়রূপ; গন্ধহীন যদি
এক কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!
আইস ভ্রমর রূপে; না জোগায় যদি
মধু এ-যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে! কি আর কহিব?
মলয় ভ্রমর দেব, আসি সাধে দোহে
বৃন্তাসনে মালতীরে! এস, সখে, তুমি;—
এই নিবেদন করে সূর্পণখা পদে।'

(লক্ষণের প্রতি সূর্পণখা : মধুসূদন)

গোধূলিপর্ব

কাঁপিয়ে মেদিনী হাসিলো বেদিনী-হাস্যে,
বাজালো বীণ তার কামের অনিবার লাস্যে।
আমি তো কোন ছার, দেবতাও হতো জানি
আমারই মতো কাবু কামুকী এ-রমণীর ভাস্যে।

কাজে লাগবে না, প্রয়োজনহীন ভেবে
নামটাও জানা হয়নি যার ; সেই নাম,
সেই নাম এখন আমার বুকের গভীরে,
আমার ভালোবাসার কয়লাখনিতে
উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতো জ্বলছে।
চন্দনকাঠের মতো আমি পুড়ে চলেছি
তার কামাগ্নিতে—,
তৃণখণ্ডের মতো নবীন জলস্রোতে
আমি ভেসে চলেছি তার ভালোবাসায়।

২০

নিঃশব্দ চুম্বনে বুঝি রুচি নেই?
বুঝি মেটে না প্রাণের তিষা?
তবে তাই হোক। এসো, পরী;
নৈশ-নির্জনতা ধুলোয় মিশিয়ে,
এই মধুরাতে আমরা দু'জনে
পরস্পরকে গাঢ়-চুম্বনে ধরি।

আমাদের সশব্দ চুম্বনে আজ
লেখা হবে পাখিদের নিশিকাব্য।

২১

কাম যে এক শাস্ত্র, শিল্পের নাম—একথা যে জানে,
আমি তো ছিলাম প্রিয় এতোদিন তাহারই সন্ধানে।

২২

আমি তো বাৎস্যায়ন, আমাকে পড়ো।
আমাকে জড়িয়ে ধরো বুকে,
উন্মীলিত স্তনগুচ্ছে, উরুর উত্থানে,
স্বর্গসুখে সমুদ্রসঙ্গমে যাও ভেসে।
তারপর টেনে নাও দু'টি পাতা আর
একটি কুঁড়ির গভীর-গোপন দেশে।

২৩

রাত যত বাড়ে,
রক্তে-মাংসে, ত্বকের লাবণ্যে, হাড়ে
আমি টের পাই তোমার আহ্বান।
মন বলে চাই, আরও চাই,
পেতে চাই কামতপ্ত মুঠোর ভিতরে।
লেহনে-মর্দনে, সঙ্গমে-শয্যায়
আমি শুনি শুধু ঘুম পাড়ানিয়া গান।

২৪

নখরা করতে জানো না, তো কিসের রমণী তুমি?

২৫

শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব, দূরদর্শনে দেখছি।
তুমি সমুদ্রকে দেহদান ক'রে
পূর্ণ গর্ভ নিয়ে ফিরে যাচ্ছো পিতৃগৃহে।
কী রক্তকাঁপনো দৃশ্য, মাগো, আর পারছি না।
তুমি কি প্রস্তুত, বীজতলা?

২৬

এসো তবে প্রিয়া,
প্রসারিত বাহুডোরে নিজেকে সঁপিয়া
বুকে বুক, মুখে মুখ, চোখে চোখ রাখি।
তারপর স্থূল-সুখে তোমার নগ্নতাকে
আমার নগ্নতা দিয়ে ঢাকি।

২৭

ওষ্ঠ আর অধরের ফাঁকে
স্বাগত জানাও সখি
আমার এ-তৃষিত জিহ্বাকে,
শিশুমুখে মাতৃস্তন্য যথা।
আমি তোমার ভিতরে
প্রবেশ করিয়া বাঁচি।

২৮

আমি আছি তোমার সিক্তদেহ সাজানো শয্যায়,
বড় হয়ে গেছি বলে ছোট হয়ে আছি লজ্জায়।

২৯

যা পেতে খুব ইচ্ছে করে, আমি তাকেই বলি সুন্দর।

প্রত্যেকটি প্রাণেরই এক-একটা স্বতন্ত্র চেহারা থাকে।
সুন্দরের কোনো নির্দিষ্ট চেহারা নেই, সে আপেক্ষিক।

সে শুধু বাইরের খোলস নয়, ভিতর ও বাইরের ঐশ্বর্য
মিলেমিশে সুন্দরের একটা দীর্ঘস্থায়ী চেহারা দাঁড়ায়।

আমি যে পৌত্তলিক, তাই পূজা করবার জন্য আমার
কোনো-একটা সুনির্দিষ্ট চেহারার দরকার হয়ে পড়ে।
নিরাকার ব্রহ্মের ভিতরে আমি তল খুঁজিয়া পাই নে।
তুমি কেমন, জানতে পেলেই আমার কল্পনার স্বস্তি।

আমার কামের অগ্নি যে-কাঠামোর মধ্যে মুক্তি পায়,
আমার অস্তিত্বের উপলব্ধি যেখানে আনন্দে বাঙ্ময় হয়
তার ভিতরেই আমি খুঁজে পাই আমার ভালোবাসা।
আমি তাকেই ভাবি আমার সুন্দর, প্রেম,—প্রিয়তমা।

৩০

নিশিসঙ্গমে সুখী হতে চাও যদি, দেহের জড়তা ভোলো,
প্রসন্ন পদ্মের পাতা ধীরে-ধীরে আকাশের দিকে।
ঝিলের জলে কাঁপুক পাতা নিশিরাতের শিশির সম্পাতে।

৩১

আমার ধর্মই হলো প্রিয়-নারী সেবা।
এ-কথা জানে না কেবা?
নির্ভয়ে তুমি শুয়ে পড়ো শয্যায়।
চাইলে দু'চোখে ঢাকতেও পারো লজ্জায়।
ক্লান্ত চরণে বুলাতে-বুলাতে হাত
যদি সে অকস্মাৎ
অগ্নিগিরির শিখর স্পর্শ করে,
তুমি আমলে নিও না।
মাফ করে দিও সেবার মাশুল ভেবে।
এতো অল্পেতে তৃপ্ত যদি না প্রাণ,
কৃতদাস হ'য়ে তোমার সেবায়
এ-দেহ করিব দান।

৩২

কাঁপছো তুমি অভ্যন্তরে?
চাচ্ছো কী, তা জানি।
বন্দি করে লাভ কী সুধা,
অঙ্গে যদি এতোই ক্ষুধা,
দিই অগ্নিতে ঘি ঢেলে।
তবু তোমার কাঁপন থামুক,
আমি না হয় ঝরে যাবো,
তুমি তো সুখ পেলে।

৩৩

'যেমন খুশি ভ্রমণ করুন
আমার দেহের যে কোনো অঞ্চলে।'
এই কথা বলে, বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে
পদ্মপুষ্পঘ্রাণ, কামার্ত শূর্পণখা
পলকে মিলিয়ে খেলো ঘূর্ণি-হাওয়ায়।

৩৪

সমুদ্র এমন আহামরি সুন্দর কিছু নয়।
সমুদ্র হচ্ছে বিশালবিপুল জলরাশি দিয়ে
সাজানো একটা চোখ-ধাঁধানো ছবি।
চূড়ান্ত সুন্দরের উৎস হচ্ছে নারী।

৩৫

আমি আজ অবমুক্ত করবো তোমাকে।
এর চেয়ে বড় সম্মান
আর কী প্রত্যাশা করো, নারী?
তোমার তুষ্টির জন্য এই মধ্যরাতেও
ভূমধ্যসাগরে আমি ডুব দিতে পারি।

৩৬

অগ্নিতে তুমি ঘৃতাহুতি দাও,
মর্ত্যে ছড়াও স্বর্গফুলের ঘ্রাণ।
তোমার চুম্বনে মৃত শব্দের
শরীরেও জাগে প্রাণ।

৩৭

শুধু তুমি, শুধু আমি—! আর কেহ নাই ঘরে।
আমরা দু'জন যেন একজনই কাঁপছি কামজ্বরে।
মন্থনে যে সুধা উঠছে তোমার সাগর থেকে,
তাকে আমি অঙ্গে মেখে বলছি, সোনা যাও,
প্রবেশ করে স্বর্ণখনির স্বর্ণ লুটে নাও।
তুমি যখন তোমার বন্ধ দুয়ার দেবে খুলে—;
বসবো আমি ভ্রমর হয়ে তোমার দেহ-ফুলে।

৩৮

জানি, চন্দ্রের আহ্বানে সমুদ্রের জলের মতন
আমার হাতের ছোঁয়ার ফুঁসে উঠবে তোমার স্তন।

৩৯

তোমার তুমির সঙ্গে যখন আমার আমির ভাব,
তরবারি তো খুঁজবেই তোমার কিংখাব।
মধুর লোভে স্তন-পাহাড়ে যাবো যখন ছুটে,
হাত পাতলে চাঁদ তুলে দিও শূন্য করপুটে।

৪০

আমার প্রেমাশক্তির তীব্রতায় যদি
তোমার দেহে আমার পুরুষোত্তমকে
গ্রহণ করার বাসনা জেগে থাকে,
তাহলে আমার নির্দেশ মেনে
এখনই উন্মুক্ত করো নাভি।

৪১

তোমার যুগল স্তনের রূপ আমি কীভাবে বর্ণনা করতে পারি,
যখন দেখি যে তোমার একটি স্তনই আকাশের চেয়ে বড়ো।

৪২

পাগলী আমার জল-সঙ্গমে ঝর্নাতলায় নগ্ন,
দৃষ্টি আমার নিবদ্ধ তার উচ্ছল জলকেলিতে।

আমি পালিত ভ্রমর তার রূপমধু পানে মগ্ন।
তোমার সঙ্গে আমিও তো চাই, প্রিয়তমা,
জলের সঙ্গে জলতরঙ্গে খেলিতে।

৪৩

আমি চাই সকল জড়তা ভঙ্গ করে,
তুমি শূর্পণখার মতো জেগে ওঠো।
আর তোমার মহাজাগরণের রুদ্ররূপ
আমি আমার প্রাণ ভরে দেখি।

৪৪

স্তনে মনে এতো সুধা,
এতো প্রেম, এতো কাম,
এতা ক্ষুধা চোখের তারায়?
পাথরেও ফোটে ফুল,
মূকও মুখর হয়
নামে ঢল মরু সাহারায়।

৪৫

আমার কামোদ্দীপ্ত নাসিকার নির্গত নিশ্বাসের শব্দ
এখন প্রদক্ষিণ করে চলেছে তোমার দেহকে।

৪৬

যেমন বাঘিনী সে, তেমন রাগিনী তার।
রসে টসটস বেদেনী,
বহিতে পারে না সুপক্ক ফলভার।
মনে হয় তুকতাকও জানে। কলাবতী।
বাড়াতে-কমাতে পারে অঙ্গের আকৃতি।

৪৭

চুমুর অধিক কাম-গান শুনিতে চাহ যদি,
আমার আপত্তি নেই শোনাতে।
আমি তো কৃষক, কৃষিকাজে আনন্দ আমার।
এসো, শস্যের জন্মভূমি খোলো,
প্রসন্ন পদ্মের পাতা আকাশের দিকে তোলো।

৪৮

হে আমার প্রিয় লজ্জাহীনা,
আর কিছু জানিতে চাহি না।
শুধু বলো, রসভারে নত বক্ষ
হালকা হয়েছে কি না?

কাল রাতে ছিলো লাল,
আজ নিশ্চয় গোলাপী সকাল।

৪৯

যখন চুম্বনকে সময়ের অপচয় বলে মনে হয়,
তখন বুঝবে, ওটাই হচ্ছে আসল সময়।
ভূমিকর্ষণ শেষে তখনই তো ধরাতলে
কৃষক বপন করে ধান।
রাতের আঁধার মাটিকে সাহায্য করে
রজঃস্রোত রুদ্ধ করে শস্যবতী হতে।

৫০

কর্ষণকালে যদি না মিলে ভূমির সাড়া, সেই কর্ষণে নাহি সুখ।
আমার জমিন চাই পলিময়, আনন্দউন্মুখ। —আমি চাই তুমি,
প্রিয়তমা, আমাকে পলকে নেবে মাটির গভীরে টেনে।
তবে না উর্বরা হবে জমি, কৃষক আনন্দ পাবে মাটি ছেনে।

৫১

নেমেছে কি মেঘ রতিগৃহ ছেড়ে?
থেমেছে কি ঝড় মধ্য-সমুদ্দুরে?

৫২

তোমার যুগল নিতম্ব-নির্মিত আকাশকে
আমি আজ ভরিয়ে দিলাম চুমুর তারায়।

৫৩

ইচ্ছা করে প্রিয়তমা, সর্ব অঙ্গ চুষি,
তোমার সঙ্গে যুক্ত করি আমার অঙ্গের খুশি।

৫৪

আজ তোমার নাভির গন্ধ বলো
ও কিসের মতো গভীর?
জল তুলে নেয়া সমুদ্রের মতো?
আমি যখন তোমার দেহের
প্রথম ক্ষতচিহ্নে চুম্বন করবো,
লজ্জার আনন্দে মূর্ছা যাবে না তো?

৫৫

তোমার গর্ভগৃহের আনন্দ আহ্বান
আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেলো।
ফ্রিজের নিশ্ছিদ্র দরোজার মতো
আমি আমার সমস্ত শরীর দিয়ে
জড়ালাম তোমার শরীর
আলোহীন, বায়ুহীন অন্ধকারে।
তারপর শুধু তুমি, আর আমি।

৫৬

আমি তো তোমার যোগ্য শয্যা এখনও সাজাতে পারিনি।
এরই মাঝে তুমি এসে গেছো, অভিসারিনী?
এসেছোই যদি কবি-অভিসারে, কবি দেহে পাতো শয্যা।
আমি ভুলি সব পুরাতন প্রেম, তুমি ভোলো শুধু লজ্জা।
অগ্নিতে দাও ঘৃতের আহুতি, জ্বালাও কামের শিখা।
জানিতে চাহি না কী না তোমার—জানি তুমি অনামিকা।

৫৭

আমি আজ জলসঙ্গমে নিঃশেষিত
আমাকে আর কামবাণে বিদ্ধ করো না।
আজ না রবি ঠাকুরের জন্মদিন?
তাঁর সম্মানে আজ আমার ছুটি।
কাল অসম্মান করো যতো খুশি।

এখন তোমার দুই স্তনাগ্র চূড়ায়
ফুটতে দাও আমার চুম্বন-কুসুম।

'কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
সেদিন হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।
করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু।
সবুনি শিখিবারে মানিলেক গুরু।
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥'

(বিদ্যার রূপদর্শন : ভারতচন্দ্র)

৫৮

কী দম্ভ করে নিতম্ব
নিশিদিন, ক্ষণে-ক্ষণে।
আমি নীপবন ভেবে
হারাই আমার পথ,
তোমার নিতম্ববনে।

৫৯

সুরাপান শেষে জড়াজড়ি করে
একই শয্যায় শুয়েছেন দুই সখী।
আমলকী, হরতকী।
আমি কি জানি না, এর অর্থ কী।

৬০

চূড়ান্ত সঙ্গমসুখে তোমাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে নেয়ার জন্য
আমি যে কী হয়ে আছি,—সে আমার সমুদ্রই শুধু জানে।
তুমি পৃথিবীর সমুদ্র দেখেছো, আমার সমুদ্র দেখো নাই!

৬১

কিষিকাব্য শুরু হোক নিশিকাব্য শেষে,
ফুলে-ফলে, ধন-ধান্যে পূর্ণ হোক ধরা।
নিশিস্মৃতি মুছে যাক দিনের আলোয় ভেসে,
বর হোক কবি, কবিবর রহুক অধরা।

৬২

মিছে কেন মাথা নত ক'রে আছো লজ্জায়?
আমিও নগ্ন, তুমিও নগ্ন।
এসো, আমার দু'জনে দু'জনার খেলা দেখি,
ওরা দোঁহে মিলে এক হোক কামশয্যায়।

৬৩

ঘড়ি ও সূর্যের সাথে পাল্লা দিয়ে
প্রবাহিত হয়ে চলেছে সময়,

আর দেয়াল ঘড়ির মতো তুমি
ঝুলে আছো আমার বুকের দেয়ালে।
সময় ছাড়া আমাদের দু'জনের
আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে
আর কিছুই প্রবাহিত হচ্ছে না।

আমাদের দু'জনের হৃদপিণ্ড দু'টি
পরস্পরকে আনন্দ দিতে দিতে
সময়ের বিরুদ্ধে ছুটে চলেছে।

৬৪

সুপ্রভাত সুনিপুণা, সুকন্যা সোহাগী!
ভাসিয়া তোমর কামে,
এসেছি জন্মের গ্রামে পুনর্জন্ম মাগি।

কী ভালোই যে লাগছে আমার জন্মগ্রামটিকে।
এখানে চির-অনাবৃত প্রকৃতি তার
সব ঐশ্বর্য মেলে ধরেছে আমার চোখের জন্য।
এই অনন্তযৌবনা গ্রাম্যবালার কামজাগানিয়া
সবুজের দিকে চেয়ে পুড়ে যাচ্ছে আমার চোখ।

তোমার কল্পিত-নগ্নতার সঙ্গে মিলিয়ে
আমি প্রাণ ভ'রে দেখছি তার অদেখা স্বরূপ,
যার স্তন বন্ধনহীন দূর-দিগন্তে বিলীন।

৬৫

কাল ছিলো উৎসের সঙ্গে মিলনের রাত্রি।
সমুদ্রের গন্তব্যকে ভুলে কাল রাত সব নদী
ফিরে গিয়েছিলো বোধির উৎসমূলে।
কাল খুব সুগন্ধ ছিলো কালো চুলে ঢাকা
লাল জবাফুলে!

৬৬

আমি বন্ধনহীন যৌবনী বায়ু
ভ্রমি দেশে দেশে শেষে পৌঁছেছি এসে
আমার প্রিয় বাংলাদেশে।

তোমার স্পর্শ পেয়ে
আমাকে ঝরতে হবে জানি।
তোমার প্রতিটি নদী-নালা,
পথ-ঘাট, পুকুর-প্রান্তর,
খাল-বিল, গুহা-গিরি
আমাকে ভরতে হবে জানি।

শরৎ আসার পরে
আমাকে মরতে হবে জানি।

৬৭

যখন তুমি রজঃস্বলা, নিষিদ্ধ সঙ্গম,
যখন তুমি অপবিত্র জবাকুসুমং
তখন আমি ফুলের কাছে যাবো।
অপবিত্র পবিত্রবা,
হবে তোমার রক্তজবা।
তোমার প্রেম নাও যদি পাই,
আমি ফুলের প্রেম তো পাবো।

৬৮

আমি লৌহকণিকা, তুমি অয়স্কান্ত মণি।
হে সুন্দরী, হে মনোমোহিনী আমার, তুমি
আজ আমাকে অমর করো একটি চুম্বনে।
তোমর কাম-সরোবরে আমাকে ফোটাও
পদ্ম ফুল ক'রে, হে প্রিয় তুমি তো পদ্মিনী।

৬৯

আমার ধর্মের নাম যৌনধর্ম।
হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম
বা খ্রিষ্টধর্ম আমার ধর্ম নয়।
যৌনধর্ম নিয়ে আমি লেখি
আমার পুরো-মানুষের গান।

যৌনমিলনের আনন্দের মধ্যে
আমি তার ইঙ্গিতই দেখি।
আমি জানি লোভ, হিংসা ও
ঘৃণাই হচ্ছে পাপের উৎস।

৭০

স্থলে ছিল এখন জলের ভিতরে প্রবেশ করেছে মৎস্য।
হা হতোস্মি! শূর্পণখার গর্ভে এসেছে শ্রীলক্ষ্মণের বৎস।

৭১

হে প্রিয়তমা, সাগরের পাখি, দেখো চেয়ে
মধু মেয়ে, আকাশে উঠেছে পূর্ণিমা-চাঁদ,
চন্দ্রমল্লিকার বনে লেগেছে আগুন।
বেরিয়ে আসবে বলে গুহামুখে লাভাস্রোত
গুনিছে প্রহর, তাকে চুম্বন পাঠাবো নাকি?

৭২

নিতেছিলে যদি, বুকে ছিলো যদি ক্ষুধা;
তবে শূন্য পাত্র পূর্ণ করিয়া সুধা,
দিতে না দিতেই স'রে গেলে কেন?
যখন সমুদ্রে জোয়ার, আসমানে পূর্ণিমা,
তখন কি কেউ ছেড়ে যায় প্রিয়তমা?

৭৩

মাগো, কী ভয়ঙ্কর। কী সমুদ্রমথিত সুখ।
কী অগ্নিকাম ফুটেছে। কামিনীই বটে।

৭৪

জিলিপির ভাঁজে যেমন রসের শিরা,
তেমনি তোমার কথার ভাঁজে ভাঁজে
লুকিয়ে থাকে চকচকে কামরসের তরবারি।
বীরপূজারী শূর্পণখা, হে জগৎশ্রেষ্ঠা নারী—,
আমি তোমার জন্য দেশও ছাড়তে পারি।

৭৫

তোমার লজ্জারাঙা চোখের পাতায়,
বা অনাবৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কামাগ্নিতে
কোনদিন যদি ঘৃতাহুতি দিয়ে থাকি,
তবে প্রিয়তমা, তোমারই আজ্ঞাবহ
ক্রীতদাসজ্ঞানে কবিরে করিও ক্ষমা।

৭৬

দিয়েছি তোমার ভাণ্ড শূন্য ক'রে।
এবার ঘুমাও তবে, প্রিয়তমা।
নিশিপদ্মের মতো তুমি ঘুমাও
আমার আনন্দ সরোবরে।

৭৭

কালো নেকার ভিতর থেকে
উপচে পড়া রসে
ভাসিয়ে দুই উরু,
দিল্লী থেকে সওদা করে
ফিরেছেন তোর গুরু।

তবে আর দেরী কেন?
শূর্পণখা, রঙ্গ করো শুরু।

৭৮

দু'টি স্তন যেন ঝুলন্ত দু'টি দুর্গা,
বির্জনের জন্য নৌকায় প্রস্তুত।
হুক খুলে দিলেই হুড়মুড় করে
ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে নদীতে।

৭৯

এসো, নিত্য রাজি কন্যা
মিলি পুনর্বার প্রভাতসঙ্গমে।
প্রমত্ত প্রমদা প্রিয়, পদ্মিনী আমার!
উদিত সূর্যের কাছে এসো দোঁহে
যাচনা করি সুবর্ণ সন্তান।

৮০

ওঠো কন্যা, প্রীতিলতা,
শোনে হে কবির কথা।
নগ্ন অঙ্গে লহ প্রিয়া
চুম্বন, চুষণ।
জানিও পুরুষই শ্রেষ্ঠ
নারীর ভূষণ।

৮১

শূন্য সুরাপাত্র হাতে কখন থেকে
আমি ডাকছি তোমায় সাকী,
তুমি শুনেও ডাকে দাও না সাড়া,
বুঝি অন্য কোথাও যাবার তাড়া?
অন্য কাউকে মন দিয়েছো নাকি?

৮২

ঠোঁট থেকে গোঁফরাশি সরিয়ে,
মুখের ওপরে মুখ নামিয়ে,
প্রাণের তিষায় প্রাণ ভরিয়ে,
টুক করে গিলে পেলো
বিষের বটিকা।
দেখবে, কিচ্ছু না।
বিষ মিথ্যা, সত্য চুম্বনামৃত,
কামের কুহুটিকা।

৮৩

উথালি-পাথালি কন্যা করে দেহ-মন,
আমার অদেখা তুমি থাকো যতক্ষণ।
যখন তোমার অঙ্গে মোর অঙ্গ রাখি,
তখনই শান্ত হয় আমার পরান পাখি।

৮৪

স্বপ্ন হও শূর্পণখা, হও সুগন্ধি বকুল,
রাতের শিউলি হয়ে ঝ'রো দুর্বাঘাসে।
নির্বসনা-বনরানী, হয়ে অরণ্যের ফুল
কবিকে জাগাও সখা কামার্ত নিশ্বাসে।

৮৫

ভোরের সূর্যের মতো আমি যেই
তোমার আকাশে উঠেছি,
আনন্দে কেঁপে উঠলো পৃথিবী।
কোথাও কি ভূমিকম্প হলো?
তুমি চোখের পলকে আমাকে টেনে নিলে
তোমার আশ্চর্য সুন্দর গুহার গহ্বরে।

৮৬

আমাকে দিয়েছো ভরে পূর্ণ দেহমন।
এইবার খরাদগ্ধ প্রকৃতিকে দাও কিছু
বারিধারা, তাকে শোনাও তরল
তরঙ্গসঙ্গীতধ্বনি, দাও উষ্ণ প্রস্রবণ।

৮৭

কী এক অজানা-অচিন, অসমী-অপার,
অমল-অনলপ্রায়, কী এক অনঘ্রাত
অদ্ভুত খুশিতে ভ'রে উঠলো আমার মন।
এখন আমার আর কিসের প্রয়োজন?

৮৮

বুঝি এতোক্ষণে কবিরে পড়িলো মনে?
প্রোষিত প্রেয়সী, হে সমুদ্রকূলবাসিনী—
লবঙ্গতিনী বনে আমি আসিয়াছি রণে,
ফিরে যাবো বলে নৈশভ্রমণে আসিনি।

৮৯

তোমার দেহ-ঘড়ি ঘুরে ঘরে
মেঘ জমে যেই অন্তঃপুরে,
আমি চাতকচোখে দেখি সজল
মেঘের আনাগোনা।
তুমি যাকে বর্জ্য বলে ভাবো,
আমি তাকে পানীয় বলি, সোনা।

৯০

বুক খুলে দাও, দেখি।
তোমার ঐ শুভ্র যুগল স্তনের চূড়া নিয়ে
শূর্পণখার নিশিকাব্য লেখি।

বলো যদি স্পর্শ করি, ঠোঁট রাখি দুই বোঁটায়;
ফোটাই বনের ফুলকে যেমন মন্মথরা ফোটায়।

৯১

তোমার উত্তাপ এখনও লেগে আছে আমার গায়ে।
তোমার নিশ্বাসের গন্ধ মাতাল করে তুলছে আমাকে।
ভাবতেই অস্থির লাগছে, কী অসহ্য ঘূর্ণি লোমকূপে!

৯২

হে কামেশ্বর, আমার প্রিয়াকে
আমার বশীভূত করো।

হে কামেশ্বর, আমার প্রিয়াকে
আমার বশীভূত করো।

হে কামেশ্বর, আমার প্রিয়াকে
আমার বশীভূত করো।

আমি এক হাজার একশ' আটটা কদম
তোমার উদ্দেশে আগুনে পোড়াবো।

হে কামেশ্বর, তোমাকে প্রণাম।
তোমাকে প্রণাম। তোমাকে প্রণাম।

৯৩

আমার তৃষিত আত্মা তোমার ভিতর
খুঁজে ফিরে মণিরত্ন, পরশ পাথর।

৯৪

আমার মিলেছি জলে-স্থলে, পদ্মাসনে,
ঊর্ধ্বরেতা যোগীর শাসনে।
আমরা মিলেছি মুখোমুখি
বৃক্ষাদিকচকে,
আমরা মিলেছি নিশি-তিলতণ্ডুলকে।

সম্পুটক চুম্বনের সেই বিন্দুমালাগুলি
মহাসিন্ধু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে
আমাদের সর্বঅঙ্গ জুড়ে।
তোমার কি মনে পড়ে?
মনে পড়ে?

৯৫

প্রিয়ারে আমার বাঙলা মুলুকে রেখে
তোমার শহরে এসেছি গালিব, আমি
ঘুমাতে পারি না, চোখ জুড়ে আছে প্রিয়া।
যেখানে তাকাই সেখানেই দেখি তারে,
জোরবাগে, চাঁদনীচকে, লালকিল্লার দ্বারে
সে আছে দিল্লীর আকাশে হেলান দিয়া।

আমার কাব্যপাঠের আসর এখনও বাকি,
তুমি হলে কী করতে গালিব, বলো?
আমি কিছুদিন তোমার কবরে থাকি,
তুমি বাঙলা মুলুকে চলো।

প্রেয়সী আমার ভালোবাসে খুব প্রাজ্ঞ প্রেমিক কবি।

'কামের উদ্রেক যে করে, সেই মেঘে সহসা দেখে তার সমুখে
যক্ষ কোনোমতে চোখের জল চেপে ভাবলে মনে মনে বহুখন;
নবীন মেঘ দেখে মিলিত সুধীজন তারাও হ'য়ে যায় অন্যমনা,
কী আর কথা তবে, যদি সে দূরে থাকে যে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন।'

পূর্বমেঘ : শ্লোক ৩
কবি বুদ্ধদেব বসু অনূদিত কালিদাস-এর মেঘদূত থেকে।

৯৬

শুধু কর্ণপরশ নহে, আমার কণ্ঠস্বর তোমার বক্ষপরশও
পায়, এই তথ্যটি আজ জানা গেলো। এ কি তোমার দয়া,
নাকি ঘুমঘোরে অসর্তক মুহূর্তে মুঠোফোনের প্রেসবাটন
ফসকে বেরিয়ে যাওয়া তোমার বুকের লুকানো চন্দ্রমুখী?

তুমি যখন তোমার শিয়রে স্থান দিয়েছিলে আমাকে—,
তাতেই আমি খুশিতে ছিলুম কতো! আর আজ, তুমি এই
পাগলকে কোন আক্কেলে জানাতে গেলে তোমার বক্ষদেশ
জয়ের গৌরব? এ যে বখতিয়ারের বঙ্গদেশ জয়ের চেয়ে
বড়ো জয় আমার। পর্বতশৃঙ্গস্পর্শের আনন্দে এখন আমার
মুঠোফোন বেচারা যদি উচ্চরক্তচাপে মূর্ছা যায়, তার দায়
বহন করবে কে?

৯৭

তুমি আমাকে চতুর শিয়ালের মতো
পা ছেড়ে লাঠি ধরতে বলো না তো।
স্নেহ নয়, আদি রস হচ্ছে কাম।
স্নেহ তো কামের অনুবর্তী।
প্রেম, বন্ধুত্ব—এগুলো হচ্ছে
কামানুভূতির সংস্কৃত প্রকাশমাত্র।
বুঝতে পারলে, বোকা মেয়ে?

৯৮

নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ
সুন্দরী রূপসী।
কমলনন্দিনী, গোলাপগন্ধিনী
হে উর্বশী—আমি
ভাবিনি স্বপনে, অস্তগগনে
উঠিবে এমন শশী।
দেখে সেই রূপ নিশি নিশ্চুপ।
যেন মধ্যাকর্ষ ভেদি
আকাশের চাঁদ
মাটিতে পড়েছে খসি।

কবি কোন্ ছার?
ধ্যানমগ্ন দেবতাও বেদমন্ত্রে
দেবীজ্ঞানে বন্দনা করে তার।
আমাদের ঊষর জীবন
ফুলেফলে, ধনধান্যে পূর্ণ করো।
আমাদের মাটি-জল
উর্বর করো, হে অপূর্বশী।

৯৯

আমি আর পারছি না।
আর পারছি না।
পারছি না।
না।

কান পাতো বিজয়িনী,
আমি তোমাকে ডাকছি,
মা!

ওহ! মাগো!
আমি আর পারছি না,
আর পারছি না,
তুমি জাগো।

১০০

তুমি আজ নাচ দেখাবে রাতে,
এ-কথা যদি আগে জানতাম
তবে আমি স্বর্গে গিয়ে
বসে থাকতাম ইন্দ্রের সভাতে।

১০১

রজনী এখনো বাকি,
এখনই নৃত্য বন্ধ করো না, পাখি।
হোক না সে নদী ঝড়ে উত্তাল—
গাঙুরের জলে ধ'রে রাখো হাল।

দুঃখ করো না, বাঁচো।
আমাকে উন্মাদ ক'রে নাচো।
আমি তো তোমারই সাকী,
ইন্দ্রকে পেয়ে আমায় ভুললে নাকি?

১০২

সুন্দরবনে মৌমাছিরা চাকে বাঁধছে মধু।
ও বাওয়ালী, একটু লক্ষ রাখিস ভাই।
মধুর জন্য তাড়া দিচ্ছে বধূ—।
ও বাওয়ালী, আগুন ঢালো চাকে।
আর কত ঘুম পাড়িয়ে রাখবো তাকে?
মধুর তোমার শেষ যে নাহি পাই!

১০৩

ওহ্, ভুলেই গেছিলাম যে তুমি কামের বুয়া।
আমিও কামের মানুষ, তোমারই গোত্রীয়।
কামের ঘামের গন্ধ আমার কাছে
সুগন্ধি আতর বা প্যারির সেন্টের চেয়ে প্রিয়।

১০৪

'ওই কপালে কী পরেছিস? তারা?
কোথায় পেলি? কে দিয়েছে সই?
বুঝি তোর ঐ কবি?
আমিও তোর সঙ্গে যাবো। দাঁড়া।
আমারে তুই লবি?'

'আজ নয়, তুই অন্য একদিন যাস।
আজ আমি যাবো শুনে—
কবি আর কবি নেই,
খুশিতে সে নিজেই আকাশ।'

১০৫

ঢেউ দিও না ঢেউ দিও না,
সখি, ঢেউ দিও না জলে।

স্থলের ঢেউ সইতে পারি,
জলের ঢেউ সইতে নারি।

তোমার সাথে দিনে-রাতে,
তাই তো আমি নিত্য হারি।
ঢেউ দিও না ঢেউ দিও না,
সখি, ঢেউ দিও না জলে।

১০৬

তাড়া দিও না, নাড়া দিও না।
চুপ ক'রে থাকো মেয়ে।

Hold your body
and let me love.

মনে করো তুমি লতা,
উঠছো চীনের দীর্ঘ-প্রাচীর বেয়ে।

কাজের সময় কোনো কথা নয়।
চুপ ক'রে থাকো মেয়ে।

১০৭

জ্বর আসছে? জ্বর?
এই জ্বর জ্বর নয়—,
এ ঝড়ের পূর্বাভাষ।
জানো না কি নারী,
যৌবনের অনিরুদ্ধ
রক্ত-কণিকায়
কামদেবতার বাস?

১০৮

মুঠোফোনে তুই আজ
ফুটালি যে ফুল—,
নয়নে জাগালো নেশা
রক্তে হুলুস্থুল।

হাওয়া দিস না বোন,
উড়ে যাবো, পুড়ে যাবো
ঝ'রে যাবো জলে।
চোখ বন্ধ রেখে
চুপ ক'রে জেগে থাকো,
ঘুমানোর ছলে।

১০৯

যখন সে সমুদ্রে নামে, লাল।
সমুদ্রও কবি হয়ে যায়।
সুন্দরের ছটা দেখে ছুটে এসে
সমুদ্র লুটায় তার পায়।
যেন সর্বস্ব হারিয়ে পাওয়া
এ-ই তার সর্বশেষ ধন।
অনন্ত আপন।

যখন সে সমুদ্রে নামে, লাল।
যখন সে উঠে আসে,
সমস্ত সমুদ্র জুড়ে পড়ে থাকে
নিঃস্ব মহাকাল।

১১০

বাতাস যেমন শোঁ শোঁ শব্দে
সমুদ্রকে ডাকে,
রথের মেলায় হারিয়ে যাওয়া
শিশু যেমন মাকে,
তেমনি ক'রে ডেকেছি আজ
আমার পাগলীটাকে।

এর পরেও কি ঐ পাগলী
আর পাগলী থাকে?

১১১

আমার এখনো অনেক পাওয়া বাকি।
আমাকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে দাও।
মূর্খতার চেয়ে ছলনা অনেক মধুর হয়,
কামভাবমুক্ত মানুষ আমার কেউ নয়।

১১২

তাই বলো-, ঐ দিন বিকেলের দিকে আমার দম বন্ধ হয়ে
আসছিলো কেন, তা এখন বেশ বুঝতে পারছি। এইভাবে
বুঝি মানুষের মুখ মোছায় কেউ? আমার মুখের ওপর আর
কিছুক্ষণ যদি তোমার শাড়ির আঁচলটা চেপে ধরে রাখতে,
তবেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ হতো।
আচ্ছা, আমার এতো মুখ মুছিয়ে দেবার কী আছে, বলো
শুনি? আমার মুখে তো কোনো ঘাম নেই, চোখে এক
বিন্দু পরিমাণ জলও নেই, লিপিস্টিকের কোনো দাগও নেই
ঠোঁটে। নেই ক্লান্তির ছাপ। তারপরও, কেউ যদি তার
শাড়ির আঁচলের ক্ষমতা জাহির করার জন্য ঐ মুখ মোছায়,
তবে বুঝতে হবে—বস্তুটির প্রয়োজনের কথা ভেবে নয়,
বরং ঐ বস্তুটিকে বস্তাবন্দি করার গোপন উদ্দেশ্যে,
নিজ-গরজেই সে তা করছে।

ঐ আঁচলের ঘামগন্ধে যে কামগন্ধ নাহি তায়,
এমন কথাও কি জোর দিয়ে বলা যায়?

১১৩

আমার চূড়ান্ত আনন্দধ্বনি 'মা—আ'।

১১৪

রক্তে আমার কী অনিবার তৃষা!
রহিতে পারি না আর স্থির যে।
ভাসাও, আমারে ভাসাও,
আমারে ভাসাও প্রেমের বীর্যে।

ভাসাও আমারে অকূল সাগরে,
নিয়ে চলো প্রিয় পারো যতো দূরে।
সেই মহাসিন্ধু দেখাও আমারে,
যার শেষ নাই, নাই তীর যে।

১১৫

অলসের তিল কোথায় আবার?
যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে।
তিল তো আর ফেরিঘাট নয়,
যে নদীর জলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে
শীত-গ্রীষ্মে সে ওঠা-নামা করবে?

দীর্ঘ অদর্শনে, জননী গো, বুঝি
তুমি ভুলে গেছো তোমার সৃজন?
পুত্রগাত্র এতো দ্রুত ভোলে কি জননী?
মনে করো, বিস্মৃতির ধুলো ঝেড়ে,
পুত্রস্মৃতি আবার জাগাও মনে।

মনে নেই চুম্বনসমুদ্রস্রোতে
তুমি কতোবার ভাসিয়েছো তাকে?
সেইসব লজ্জাহীন দিনের স্মারক
হয়ে, জননী গো, তোমার পুত্রের
ছোটো-বড়ো,
স্পষ্ট-অস্পষ্ট,
কালো ও ধূসর—প্রতিটি তিলই
তাদের স্ব-স্ব অবস্থানে আজও
আছে সেই প্রথম দিনের মতো।

তিল তো আর ফেরিঘাট নয়,
যে নদীর জলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে
শীত-গ্রীষ্মে সে ওঠা-নামা করবে?

তুমি শুধু স'রে গেছো দূরে।

১১৬

ঈশ্বর আমাকে সমীহ করেন।
কারণ তিনি জানেন,
অগ্নিসঙ্গমজাত তাঁর এ-পুত্রটি
অগ্নিগুণে গুণান্বিত।
সর্বপাপঘ্ন, সে অপাপবিদ্ধ।

অগ্নির অস্পৃশ্য কোন্ জন?

১১৭

আমার মনকে আমি ঘুম পাড়িয়ে
রেখেছি আমার মনে।
তাই সে ঘুমে পাথর হয়ে আছে।
সেই ভালো, সে জাগলেই তো
আবারও আগুন লাগবে বনে।
যাকেই সে সামনে পাবে—
তাকেই জড়াবে অগ্নি-আলিঙ্গনে।

তার চেয়ে তো এই ভালো—,
দেহ-মনের ত্রৈরথ থেকে দূরে,
আমার সকল কথারা থাকুক
আমার মনের অন্তঃপুরে।

১১৮

মধ্যরজনীতে তোমাকে জাগ্রত পেয়ে আমার বুক কাঁপছে
ভয়ে, হাত কাঁপছে আনন্দে। ভাবিনি ঘুম-সাগরের অতল
থেকে প্রজাপতি হয়ে আমাকে তুমি ডাক দেবে তোমার
পাশে। 'আগুনের মোর পাশে কে আনে?' রবি ঠাকুরের
গান বাজছে আমার বুকে। ভাষার সন্ধানে আমার মন
হাতড়ে বেড়াচ্ছে চরাচর। তোমার অকালবোধনের যোগ্য
ভাষা খুঁজে না পেয়ে, তোমাকে মুগ্ধ করতে না পারার অক্ষম
বেদনায় বন্দি পাখির মতো ছটফট করে মরছে আমার মন।

তোমার ঘুম-ভাঙা প্রজাপতিটি যে ঠিক কোন ফুলের মধু
পছন্দ করে-,তা ঐ প্রজাপতিই জানে। আমি এতো কষ্ট

ক'রে তার জন্য সুন্দরবনের বাওয়ালীদের কাছে থেকে
সদ্যভাঙা চাকের মধু সংগ্রহ করে আনলাম। তাতে একটু
দেরি হলো বটে, তাই বলে যে আমার ক্ষণিকের প্রজাপতি,
মধুর বদলে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তুমি?

১১৯

যে যেমন, সে সেমন স্বপ্ন দেখে। যে যারে যেমন করে চায়,
মাঝে-মাঝে ক্ষণকালের জন্য হলেও সে তারে ঠিক সেমন
করেই পায়। স্রষ্টা মানুষকে বাস্তবের না-পাওয়ার ক্ষতি
পুষিয়ে দিতেই মনে হয় এই স্বপ্নের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছেন
মানুষের মস্তিষ্কের ভিতরে।

শুধু স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্নও কম দেখে না মানুষ। কিন্তু স্বপ্ন
শব্দটি মূলত পজেটিভ, সদর্থক। মানুষের উপরি পাওয়া
এক গোপন ঐশ্বর্য। সে যেন এক ভিন্ন পৃথিবী, সে যেন
এক সব পেয়েছির দেশ। যেখানে আকবর বাদশা ও
হরিপদ কেরানি একই রমণীর প্রেমে পড়ে। সেখানে না
ভাই বোনকে, না বোন তার ভাইকে ছেড়ে কথা কয়।

আমি তো আর তোমার মতো বোকা নই, যে মেঘের পিঠে
চড়ে প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে সময় নষ্ট করে উড়ে বেড়াবো
আকাশে-আকাশে। আমার স্বপ্নগুলো আমার অনিবৃত্ত
গোপন বাসনার রূপকার হয়েই আমাকে ধরা দেয়। আমার
স্বপ্নেরা খুব ভালো করেই জানে—আমি কী চাই। তবে
অজানা অচেনা অনেক মুখও আসে আমার স্বপ্নে। তারা
কেন আসে? তারা কারা—? আমি তা জানি না।

১২০

তুমি আর গুনগুন করবে কেন?
ফুলের মধ্যে বসতে পারা ভ্রমর
কখনও গুন গুন করে নাকি?
তুমি তো বসেই গেছো ফুলে।
এখন তোমার মধু খাওয়ার পালা।

তোমার চারপাশে উড়ে-উড়ে,
ঘুরে-ঘুরে গুনগন করবো আমি।
ডানায় আমার ওড়ার ক্লান্তি,
চক্ষে আমার তৃষ্ণা। বক্ষে জ্বালা।

১২১

আমি কান পেতে রই,
প্রাণ পেতে রই,
চোখ পেতে রই স্ক্রিনে।
কখন তুমি গানের মতো,
সর্বনাশা বানের মতো,
রুদ্রকাম উত্থানের মতো
প্রবেশ করো
আমার মুঠোফোনে।

১২২

যাওগো তুমি যাবার আগে
রাঙিয়ে দিয়ে যাও।
সূর্য যেমন যাবার আগে
সপ্তবর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে
জড়িয়ে ধরে পাহাড়-চূড়;
তেমনি আমায় জড়াও সখা।
জড়াও যেমন মৌমাছিরা
জড়ায় ভাঙা চাক মধুর।

১২৩

মুঠোফোন নিয়ে চলো অভাজনে,
চিরযৌবনে, চিরকামনার দেশে;
যেন সন্ধান পাই এই রহস্যময়ীর
যেনন চিনিবারে পাই, কে সে!

১২৪

প্রথম ফাগুনে
পোড়াবে দেহ যদি
কবির আগুনে,
নগ্নদেহপটে
ফোটাও ফুল যথা
মূল্য না বুঝে
ফোটায় ফুলবন
সংখ্যা না-গুনে।

বিলাও রূপরস
গন্ধ সুধাময়ী।
নারীর প্রেম বিনা
কবি কি হয় জয়ী?

১২৫

শুভরাত্রি বলিও না, বলিও না প্রিয়া,
তোমার অঙ্গ পরশিব ফের কবে?
কখন তোমার তুমিটি আমাকে লবে—
সেই আনন্দ আবেগে কাঁপিছে হিয়া।

১২৬

ওঠো সখি, ত্বরা করি পরো অন্তর্বাস,
অঙ্গ থেকে মুছে ফেলো আমার সুবাস।
বিদায় নেবার আগে বিদায়ী চুমুতে
আমাকে অজ্ঞান করে দাও অঘোরে ঘুমুতে।

১২৭

তোমার সমুদ্র যদি তোমার শোণিতে লাল,
আমার কী দোষ বলো?
আমি তো তোমাকে দিইনি বিরহকাল।

১২৮

এই মেয়ে, দেখো চেয়ে,
চোখ খোলো, ভয় কী?
আমার এ-দেহপটই
তোমার প্রার্থিত নয় কি?

১২৯

আমার সঙ্গে বসো না,
নষ্ট হয়ে যাবে।
আমি তো পথ যাই না ফেলে,
পথ কুড়িয়ে চলি।
চলতে চলতে রঙ্গরসে
অঙ্গে ঢলাঢলি।
আমার সঙ্গে চলো না পথ—
ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

১৩০

আমার কাছে ধরা দিতে
ভয় পাচ্ছো না তো?
পাচ্ছো না ভয় যদি,
পা-মোহনায়
কাঁপছে কেনো নদী?

পাচ্ছো না ভয়? বেশ,
তবে চোখ বোঁজো,
ঠোঁট পাতো।

১৩১

এতোদিন নিচে ছিলে,
এইবার উপরে উঠেছো।
আমি নিচের মানুষ,
বাগানের মালী,
ফুলে জল ঢালি।
তুমি উপরের ফুল,
রক্তশিমুল—
তাই উপরে ফুটেছো।

১৩২

মধুময় হোক এই বাক্‌দান।
সারাজীবনে সঞ্চিত মধুসহ
মৌমাছি আজ
বধূরে করিবে চাক দান।

তোমাদের হোক জয়,
জীবনের মধু মধুর জীবনে মিশে
মধুতেই হোক লয়।

১৩৩

এই পোড়া তো সেই পোড়া নয়,
এই পোড়াতে দেখবি কী যে সুখ!
আমি কেমন করে পোড়াই জানিস?
জানিস না তো? বলি,
আমি সবার আগে কুসুমবাগে
স্থাপন করি মুখ।

১৩৪

তুমি যে আমার লাল, আহা,
এতোদিন কেনো যে বলোনি তাহা?
দেখিতাম দুই নয়নে পরান ভরে,
পুরুষ যেমন তার প্রথম নারীকে
একটু-একটু ক'রে
আদরে সোহাগে নগ্ন করিয়া দেখে।
শিখিতাম কামকলা,
শিশুরা যেভাবে প্রথম বর্ণ শেখে।

রাত্রি আমার কাটিতো তোমার স্তবে।
ভাবিনি কখনও আগে,
একটি ছোট্ট শব্দের কলরবে
রক্ত আমার এতোটা মাতাল হবে।

১৩৫

আহারে আনন্দ, তুমি অপূর্ব অপার!
আমাকে যে তুমি অঙ্গে ধরেছো,
আপন জানিয়া তোমার করেছো—
সেই তো আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

১৩৬

প্রেমের প্রয়োজন ফুরালে
জীবন হারায় মজা মরুতে,
জাগে না কামতিষা,
রহে না জিজীবিষা—
ফোটে না কুসুম মৃত-তরুতে।

১৩৭

তোমার জন্য মৌমাছি হয়ে
জমিয়েছি মধু বীর্যকে,
তোমার জন্য ধনুকের মতো
তীরকে বেঁধেছি তির্যকে।

১৩৮

কিছুক্ষণ থাকো, বন্ধু বলে ডাকো।
আমার ভাণ্ড শূন্য ক'রে রাতে,
তোমার ভাণ্ড পূর্ণ ক'রে সেবো।
খুব বৃষ্টি হচ্ছে এখন ঢাকাতে।

'লাজ নাহি চল চল কেমনে এমন বল
পুরুষের কেন এত ঠাট।
যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে
কে কোথা দেখেছে হেন নাট॥

চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে।
ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে।'

(বিপরীত বিহার : ভারতচন্দ্র)

সুচিত্রা সেন

তোমার চুলে-চোখে, ঠোঁটে-স্তনে,
নিতম্বে-গ্রীবায়
ছিলো সুন্দরের সুষম বণ্টন।

তোমার কণ্ঠস্বরে ছিলো মধু
হাসিতে হিল্লোল—
আর ক্রন্দনে মৃত্যুর হাহাকার।

আমার যৌবনে
তুমি ছিলে প্রিয়ার প্রতীক।

প্রেমের প্রকর্ষে, কামের দহনে
আমি তোমাকে পেয়েছি স্বপ্নে,
আলিঙ্গনে, বারবার।

হে প্রেম জাগনিয়া বঙ্গের উর্বশী,
হে চিরযৌবনা, চিরঅধরা আমার—
এই চিরবিরহী কবির
অনাশ্রিত প্রেমের অঞ্জলি
তুমি নাও।

স্তনের ওপারে

যতদূর হাত যায়,
শুধুই স্তনের কোমলতা।
বিস্তৃত, বিশাল
বিনিদ্র সুমদ্র যেন
অকূল-অপার।

পরমকরুণাময়, হে ঈশ্বর।
তোমার কবিরে
হাত ধ'রে নিয়ে চলো
অন্তহীন স্তনের ওপারে।

আমি বাঁচি।

নিমন্ত্রণ

যখন আমি একলা থাকি ঘরে
তুমি একা এসো চুপটি ক'রে।
তখন শুধু তুমি, তখন শুধু আমি,
আর কেহ নাই বিশ্ব চরাচরে।

আত্মনিয়ন্ত্রণে মুক্তি
যখন আরাধ্য নয় আমাদের,
যখন আমরা পরস্পরের
কামনা নিধনে ব্রতী;
তখন মনে-মনে কাছে এসে
ক্ষণে-ক্ষণে ফিরে যাওয়া,
সে আমাদেরই ক্ষতি!

চিরঅনাবৃতা, হে নগ্নতমা

বস্ত্রের আড়ালে বর্ধিত নারীদেহ
আমি তো দেখেছি ঢের—।
উলঙ্গতা আর নয়,
অজন্তার গুহাগাত্র ও প্যারিসের
চিত্রশালা থেকে উঠে এসে
তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো
একবার শুধু সামনে দাঁড়াও।

চিরঅনাবৃতা হে নগ্নতমা—
অনুমতি দাও প্রিয়,
চক্ষু পুড়িয়ে, হৃদয় জুড়িয়ে
বারেক তোমায় আমি দেখি।

আমি তো প্রণম্য নই

আমাকে প্রণাম করো কেন?
আমি তো প্রণম্য নই,
আমি চাই তোমার চুম্বন।
আমি চাই কামস্পর্শ,
মুক্ত-তার বিদ্যুতের মতো
তরুণার তীব্র আলিঙ্গন।

আমাকে প্রণাম করো কেন?
আম কি প্রণম্য নাকি?
আকাশের যত তারা-শশী
আমি সকলের সমান বয়সী।
কবি সে তো অনশ্বর কাল।
কবিচিত্ত তাই এতো
নবনিত্য প্রেমের কাঙাল।

কল্পভ্রমণ : নারিতার পথে

যখন ঢাকার আকাশে কোনো
বোয়িং বিমান ওড়ে,
আর আমার কর্ণকুহরে
প্রবেশ করে তার শব্দ—
আমি সেই বিমানের অভ্যন্তরে
আবিষ্কার করি আমাকে।

আকাশের মেঘলোক চিরে,
হে প্রিয়তমা আমার
আমি তোমার উদ্দেশ্যে উড়ে যাই।

আমার কল্পনাজুড়ে থাকো তুমি।
শুধু এক অবিচ্ছিন্ন তুমি।
সেই কল্পনার টানে
আমি আমার পাশের আসনে
হঠাৎ আবিষ্কার করি তোমাকে।

তুমি কি কল্পনাকুসুম?
আমার আর বিলম্ব সহে না।

সহযাত্রীদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে,
আমি সিটবেল্ট বাঁধার সময়
তোমাকে আমার সঙ্গে বাঁধি।
তুমি আর আমি মুখোমুখি হই,
আর মিশে যাই এক অঙ্গে—
নক্ষত্রের মতো নগ্ন নীলাকাশে।

আমি তোমাকে চুম্বন করি,
তৃষিত পথিক যেমন অমৃতজ্ঞানে
মরুপথে পান করে জল।

অজন্তার শিল্পমূর্তি হয়ে
তুমি তোমার নগ্নযুগল পায়ে
আকড়ে ধরো আমার কটিদেশ,
যেন আমি খুব সহজেই
খুঁজে পাই গন্তব্য আমার।

না, এই সিটবেল্টের বন্ধন থেকে
তোমাকে আমি মুক্তি দেবো না,
যতক্ষণ না তুমি
আমাকে উগলে দিচ্ছো নারিতায়।

ইয়াসুকু, আমার জাপান

তোমার ঈষৎ-এলানো স্তনের
মাঙ্গলিক আলোর উল্লাসে
যখন উদ্ভাসিত হয় এ পৃথিবী,
আমরা ভাবি সূর্য উঠেছে।
বলি, জাপান সূর্যোদয়ের দেশ।

কিন্তু তোমাকে দেখার পর,
ইয়াসুকু, আমি নিশ্চিত হয়েছি,

আমরা যাকে সূর্য বলে ভাবি—
সে তোমার স্তনযুগলের বিভা।

তোমার উৎপলশুভ্র উরুদ্বয়
ঐক্যবদ্ধ হয়ে
যে-দৃশ্য নির্মাণ করে—,
সেই হচ্ছে উড়ন্ত আকাশ।

অথচ তোমাকে দেখার আগে,
এই আকাশ-সম্পর্কে
আমার কী ভুল ধারণাই না ছিল!

স্ত্রী

রান্নাঘর থেকে টেনে এনে স্তনগুচ্ছে চুমু খাও তাকে।
বাথরুমে, ভেজানো দরোজা ঠেলে অনায়াসে ঢুকে যাও,
সে যেখানে নগ্ন-দেহে স্নানার্থেই তৈরী হয়ে আছে
আলোকিত দুপুরের কাছে—
মনে রেখো তোমার রাত্রি নেই, অন্ধকার ব'লে কিছু নেই।
বিবাহিত মানুষের কিছু নেই
একমাত্র যত্রতত্র স্ত্রীশয্যা ছাড়া। তাতেই শয়ন করো,
বাথরুমে, পূজোঘরে, পার্কে, হোটেলে—;
সন্তানের পাশ থেকে টেনে এনে ঠোঁটগুচ্ছে চুমু খাও তাকে।

তার প্রতিটি উৎফুল্ল লগ্নে এক-একটি চুম্বন,
প্রতিটি রক্তিম মুখে এক-একটি নিঃশ্বাস দিতে হবে।

সভ্যতা ধ্বংস হোক,
গুরুজন দাঁড়াক দুয়ারে,
শিশুরা কাঁদতে থাকে,
যতদূত ফিরে যাবে এবং অভাব দেখো
লজ্জা পেয়ে ম্লান হবে কিশোরীর মতো।

যেমন প্রত্যহ মানুষ
ঘরের দরোজা খুলে দেখে নেয় সবকিছু ঠিক আছে কিনা—

তেমনি প্রত্যহ শাড়ির দরোজা খুলে স্ত্রীকেও উলঙ্গ ক'রে
দেখে নিতে হয়, ভালো ক'রে দেখে নিতে হয়
জঙ্ঘায়, নিতম্বে কিম্বা সংরক্ষিত যোনির ভিতরে
অপরের কামনার কোনো কিছু চিহ্ন আছে কিনা!

সহবাস

কী দেখো অমন করে আমার ভিতরে?
আমি দেখি, আমি কি কেবলই দেখি? নীহারিকা,
শুধু পটে লিখা, তুমি কি কেবলই ছবি?
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে-মানুষেরে। আমি তাই
চোখে চোখে ভালোবাসা দেখি, ভাবি,
বাচাল ছেলের মতো বেয়াদপ পঙক্তিগুলো
কী ক'রে যে প্রতিদিন লজ্জাহীন নাচায় আমাকে।

তোমার শয়ন ঘরে সারারাত নাচি ধেই ধেই,
তুমি থাকো, আমি থাকি পাশাপাশি দুই ফ্ল্যাটে
কোনোই দেয়াল যেন নেই মাঝখানে।
চোখে চোখ থাকে, হাতের ভিতরে তার মাংসপিণ্ড
জ্বলে, কথা দিয়ে কথাই জড়াই।
ক্ষীণ কটি আলো দেয় কৃষ্ণকররেখার আঁধারে,
তবু রোজ মন এসে বলে : ভালোবাসা বলে কিছু নাই।

মৃত্যু আর রমণীরা যেন ঠিক সমান বয়সী,
অভাব আর অক্ষমতা জীবনের সমান দোসর।
আমি যাকে ভালোবাসি, যাকে ভাবি সবচেয়ে
প্রিয়তম জন, সে আমার জন্মাবধি অভিন্ন মরণ।
কিছুই হয় না বলে লিখছি কবিতা, আত্মতুষ্টি ছাড়া
তাই এর মূল্য কোনোকিছু নাই। উপরন্তু তুমি রুদ্র,
তোমার ওখানে যেতে ভয় পাই, যেহেতু বন্যাকে
রোখে কবিতার যতিচিহ্ন নয়, প্রেমের আগুনে-পোড়া
কোমল মোমের সাদা ছাই।

তবুও কবিতা লিখি,
কবিতার অন্তরালে তোমাকে জানাতে চাই এবং

বানাতে চাই একটি শব্দের মানুষ, অবিকল
আমার মতন করে মৃত্যুহীন তোমার ভিতরে।
সবচেয়ে কম দাবি নিয়ে যায় সাথে নিত্য সহবাস,
সবচেয়ে কম কথা বলে যাকে খুব কাছে পাওয়া যায়,
সবচেয়ে কম ভালোবেসে যার কাছে অভিমান থাকে,
তাকেও বিরক্ত করি মাঝে মাঝে, তাকেও জাগাই
ডেকে অসময়ে মধ্যরাতে সাধুসঙ্গ থেকে। মুহূর্তেই
সে-মানুষ রক্তের শাড়ি পরে হয়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষিতা নারী,
পায়েতে ঘুঙুর বাঁধা, খোঁপায় অজস্র পাখি
বাঁকানো বাহুর বৃত্তে নৃত্য করে কাঁপায় আমাকে।
আমি তার মৃতুদেহ সযত্নে টাকার মতো
বেদনার বাক্সে তুলে রাখি।

তারপর একটি মুহূর্ত আসে, যখন নিজের কাছে
আমি নিজে ধরা পড়ে যাই—; একটি সময় আসে
যখন সন্ধ্যা নামে, বিশ্বাসের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে
জনৈক আল্লার বান্দা উঠে যায় আকাশের দিকে—
সমুদ্রের শঙ্খ ডাকে অঘ্রানের শীতল বাতাসে।

আমি চোখের সমস্ত দৃষ্টি মেলে আকাশে ঈশ্বর খুঁজি,
ক্ষীণকণ্ঠে পাখি দেখে বলে উঠি :
'এই ভগবান, আমাকেও পাখা দাও,
তোমাকে বিশ্বাস করি, বন্ধুরা নাস্তিক জানে,
সুতরাং বলো না তাদের, কিছু কিছু রূঢ় সত্য
সংগোপনে সংরক্ষিত রবে আমাদের কোনো কোনো
জীবনের কাছে আজীবন।'

একজন জানতে চেয়েছে, ভগবান কি আছেন?
আমি ব্যঙ্গচ্ছলে তাকে খুশি করে বলেছি : 'ব্রোথেলে।'
—তুমি জানতে চেয়েছো তোমাকে ভালোবেসে
এখনো আগের মতো দুঃখ পাই কিনা;
আমি হেসে হেসে কত সহজেই অকৃত্রিম কণ্ঠস্বরে
বলেছি— 'পাগল!' প্রথমটির জন্যে ক্ষমা চেয়েছি রাত্রে,
দ্বিতীয়টি তোমার সান্নিধ্যলোভে তোমাকে ঠকানো,
মিথ্যে বলা, কেননা সত্য শুধু অপ্রকাশ্যে জ্বলে।

মৈথুন শেষ হয়ে গেলে যেমন নিজেকেও অপ্রিয়—
—দোষী, অপরাধী মনে হয়;—অবসাদ সারা দেহে
টানায় তাঁবুকে, ঠিক সেরকই ক্লান্ত অবসাদ
আমার কপাল জুড়ে আজ রাত বসে আছে
লোভী মৎস্য-শিকারির মতো জলহীন অতল-পুকুরে।
মৎস্য কি শয়ন করে চোখ বুজে ঘুমায় কখনো?
আমি সেই অতল জলের সত্য জেনে নিতে গিয়ে
একটি অনামা ঝিলে আজ রাত মৎস্যদের
প্রধান অতিথি। চারপাশে রূপচাঁদা, শীতমাখা মাছ,
যেন জীবনের অপরূপ আনন্দের মেলায় এসেছি আমি,
এভিনিউ নেই, সব স্ট্রীটে জলো অন্ধকার;
বাড়ির ঠিকানা চাই, কোন ব্লকে তুমি থাকো,
পাতালের কোন্ খাদে এমন সবুজ ঘাস জমে আছে
পুষ্পিত লনে? কোনো কিছু জানা নেই,
বুঝি তাই এতো পথ হেঁটে এসে ফিরে যেতে হবে
ব্যর্থতার মূর্ত কলরবে।

তোমাকে দেখার নামে তবুও তো দেখেছি অনেক,
জলের ভিতর দিয়ে সাঁতরে গিয়েছি চলে
সীমান্তের বলীরেখা ছিঁড়ে, যে ঘরে স্নানের শেষে
রমণী বদল করে অপবিত্র রাতের পোশাক
তার সে উলঙ্গ আভা, আঁশটেহীন দেহ
দেখেছি লুকিয়ে থেকে লেলিহান আগুন শিখায়।

তোমাকে দেখার নামে কুক্কুর আর কুক্কুরীর
অচ্ছেদ্য সঙ্গম দেখা হলো। —মধ্যরাতে কলঘরে
জলের শব্দ শুনে প্রশ্ন জেগেছিল, এতো শীতে
এতো জল কার প্রয়োজন? তুমিও কি গতরাতে ছিলে
তার সাথে? তুমিও কি অবশেষে গর্ভে নিলে মানুষের
অমেয় সন্তান? তোমাকে দেখার নামে পুকুরে স্নানের শেষে
ঘরে ফেরা মায়ের গোপন মুখ ভেসে উঠেছিল।

এইসব স্মৃতি মনে এলে পাতায় পাতায় পড়ে
কবিতার বিষণ্ন শিশির। স্যাণ্ডেল আঁকড়ে-ধরা
পিচের শহর কথা বলে, ভোঁ ভোঁ করে ঘোরে,

গান গায়, রেডিওতে স্বরচিত কবিতা শোনায়,
কেউ কেউ কাঁদে, দুপুরে উইকেট পড়ে স্টেডিয়ামে,
বিকেলে সমস্ত সিটি জড়ো হয় চায়ের টেবিলে।
উঠতি চুলের মতো লতানো আঁধার নিয়ে রাত্রি নামে
বুড়ো নীলক্ষেতে। স্মৃতির খাদের ক্লেদে কী যেন
গিয়েছে ডুবে, —ভালোবাসা, মৃত্যু, প্রেম,
বরফের নিচের তিবেতে।

নৈশ-প্রতিকৃতি

ঐ যে ছায়ার মতো একটি মানুষ পথ হাঁটে, তাকে চেনো?
হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার। তাকে চেনো?
ঐ যে ছায়ার মতো বাউলের অবিন্যস্ত চুল, পরম বন্ধুর মতো
দুটি পা, দুটি চোখে দুটি দ্বিধা, তাকে চেনো?
ঐ যে ছায়ার মতো একটি পুরুষ মধ্যরাতে, কাকভোরে, কবরের
পাশ দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে গ্রীন লেনে ফেরে। তাকে চেনো?

ঐ যে উজ্জ্বল মূর্তি একটি যুবক, কৃত্রিম প্রেমিক সেজে সারাদিন
নারীসঙ্গে চুর হয়ে থেকে রাত্রি এলে গণিকার স্তন্য চুষে খায়—
তাকে চেনো? ঐ যে ছ'ফুট দীর্ঘ সীমাহীন অসীম আগুন?

হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার। সম্প্রতি সে
তীব্রভাবে আসক্ত নেশায়। প্রভাতে প্রেমের যোগ্য, পূজার চন্দন,
কোমল কুমারী চোখ, সলজ্জ রক্তিম নাকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম,
দেখে ভুলে মনে হবে এ-কোনো ঋষির পুত্র অসম্ভব নারীর প্রেমিক।

অথচ সূর্যের তাপে রক্তের বীর্য গলে গেলে—পাকস্থলী নেচে ওঠে।
গাঁজা, মদ, মোহের নেশায় ড্রাগের ড্রাগন যেন চেপে বসে ঘাড়ে।
ঘুঘুর চোখের মতো তার ক্লান্ত দুটি চোখ লাল গোল বৃত্ত হয়ে যায়,
তাকে চেনো? মাতৃহীন যে-যুবক রাত্রি এলে গণিকার স্তন্য চুষে খায়?

হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার।

মৈথুন শেষ হয়ে গেলে যেমন নিজেকেও অপ্রিয়—
—দোষী, অপরাধী মনে হয়;—অবসাদ সারা দেহে
টানায় তাঁবুকে, ঠিক সেরকই ক্লান্ত অবসাদ
আমার কপাল জুড়ে আজ রাত বসে আছে
লোভী মৎস্য-শিকারির মতো জলহীন অতল-পুকুরে।
মৎস্য কি শয়ন করে চোখ বুজে ঘুমায় কখনো?
আমি সেই অতল জলের সত্য জেনে নিতে গিয়ে
একটি অনামা ঝিলে আজ রাত মৎস্যদের
প্রধান অতিথি। চারপাশে রূপচাঁদা, শীতমাখা মাছ,
যেন জীবনের অপরূপ আনন্দের মেলায় এসেছি আমি,
এভিনিউ নেই, সব স্ট্রীটে জলো অন্ধকার;
বাড়ির ঠিকানা চাই, কোন ব্লকে তুমি থাকো,
পাতালের কোন্ খাদে এমন সবুজ ঘাস জমে আছে
পুষ্পিত লনে? কোনো কিছু জানা নেই,
বুঝি তাই এতো পথ হেঁটে এসে ফিরে যেতে হবে
ব্যর্থতার মূর্ত কলরবে।

তোমাকে দেখার নামে তবুও তো দেখেছি অনেক,
জলের ভিতর দিয়ে সাঁতরে গিয়েছি চলে
সীমান্তের বলীরেখা ছিঁড়ে, যে ঘরে স্নানের শেষে
রমণী বদল করে অপবিত্র রাতের পোশাক
তার সে উলঙ্গ আভা, আঁশটেহীন দেহ
দেখেছি লুকিয়ে থেকে লেলিহান আগুন শিখায়।

তোমাকে দেখার নামে কুক্কুর আর কুক্কুরীর
অচ্ছেদ্য সঙ্গম দেখা হলো। —মধ্যরাতে কলঘরে
জলের শব্দ শুনে প্রশ্ন জেগেছিল, এতো শীতে
এতো জল কার প্রয়োজন? তুমিও কি গতরাতে ছিলে
তার সাথে? তুমিও কি অবশেষে গর্ভে নিলে মানুষের
অমেয় সন্তান? তোমাকে দেখার নামে পুকুরে স্নানের শেষে
ঘরে ফেরা মায়ের গোপন মুখ ভেসে উঠেছিল।

এইসব স্মৃতি মনে এলে পাতায় পাতায় পড়ে
কবিতার বিষণ্ন শিশির। স্যাণ্ডেল আঁকড়ে-ধরা
পিচের শহর কথা বলে, ভোঁ ভোঁ করে ঘোরে,

গান গায়, রেডিওতে স্বরচিত কবিতা শোনায়,
কেউ কেউ কাঁদে, দুপুরে উইকেট পড়ে স্টেডিয়ামে,
বিকেলে সমস্ত সিটি জড়ো হয় চায়ের টেবিলে।
উঠতি চুলের মতো লতানো আঁধার নিয়ে রাত্রি নামে
বুড়ো নীলক্ষেতে। স্মৃতির খাদের ক্রেদে কী যেন
গিয়েছে ডুবে, —ভালোবাসা, মৃত্যু, প্রেম,
বরফের নিচের তিবেতে।

নৈশ-প্রতিকৃতি

ঐ যে ছায়ার মতো একটি মানুষ পথ হাঁটে, তাকে চেনো?
হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার। তাকে চেনো?
ঐ যে ছায়ার মতো বাউলের অবিন্যস্ত চুল, পরম বন্ধুর মতো
দুটি পা, দুটি চোখে দুটি দ্বিধা, তাকে চেনো?
ঐ যে ছায়ার মতো একটি পুরুষ মধ্যরাতে, কাকভোরে, কবরের
পাশ দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে গ্রীন লেনে ফেরে। তাকে চোনো?

ঐ যে উজ্জ্বল মূর্তি একটি যুবক, কৃত্রিম প্রেমিক সেজে সারাদিন
নারীসঙ্গে চুর হয়ে থেকে রাত্রি এলে গণিকার স্তন্য চুষে খায়—
তাকে চেনো? ঐ যে ছ'ফুট দীর্ঘ সীমাহীন অসীম আগুন?

হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার। সম্প্রতি সে
তীব্রভাবে আসক্ত নেশায়। প্রভাতে প্রেমের যোগ্য, পূজার চন্দন,
কোমল কুমারী চোখ, সলজ্জ রক্তিম নাকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম,
দেখে ভুলে মনে হবে এ-কোনো ঋষির পুত্র অসম্ভব নারীর প্রেমিক।

অথচ সূর্যের তাপে রক্তের বীর্য গলে গেলে—পাকস্থলী নেচে ওঠে।
গাঁজা, মদ, মোহের নেশায় ড্রাগের ড্রাগন যেন চেপে বসে ঘাড়ে।
ঘুঘুর চোখের মতো তার ক্লান্ত দুটি চোখ লাল গোল বৃত্ত হয়ে যায়,
তাকে চেনো? মাতৃহীন যে-যুবক রাত্রি এলে গণিকার স্তন্য চুষে খায়?

হাজার বছর নয়, এ-শহরে একযুগ কেটেছে তাহার।

তুমি

কী নাম তোমাকে দেবো, কোমলগন্ধার নাকি
বসন্তের অন্ধকারে পথহারা পাখি?
'কামনা তোমার নাম'—বলতেই লজ্জামাখা আঁখি
তুমি ঢেকেছো আঙুলে; তারপর প্রেম এসে
চুপিচুপি চুলে যেই বসেছে তোমার,
'বিনিশা-বিনিশা' বলে আমিও আবার কাছে আসিয়াছি।
তোমার মুরত দেহে ছুঁয়েছি বকুল।
সমুদ্রের ঝড়োরাতে অনায়াসে ভেসে-যাওয়া খড়কুটো,
পাপের আঙুল, তুমি ফিরালে না কেন?

তুমি কি কখনো চাও লাটোরের বনলতা হতে,
অথবা আমার হাতে পদ্ম হয়ে ভাসতে মৃণাল?
কাছে এসো প্রিয়তমা, কাছে এসো প্রিয়া,
—বলে যেই নগ্ন হাতে ডেকেছি তোমাকে;
তুমি কেন পরিপূর্ণ হৃদয় সঁপিয়া প্রেমের দুর্বল লোভে
ঝাঁপ দিতে গেলে যৌবনের অনির্বাণ অসীম চিতায়?

কী নাম পছন্দ করো, পদ্মাবতী নাকি ক্লান্তি,
কী নাম তোমাকে দেবো? বলো কোন্ নাম।
যদি বলি তুমি লজ্জা, লাজুক পাতার মতো প্রিয়,
প্রিয়মাণ, তবে কেন শিশিরের সুস্পষ্ট ছোঁয়ায়
মধ্যরাতে জেগে ওঠো লজ্জাহীনা হয়ে?

মাঝে মাঝে মনে হয় তুমিও ঘৃণার যোগ্য,
লাজহীন, অসুন্দর, ভীষণ কুৎসিত এক নারী।
লজ্জা নয়, আঁখি নয়, কোমলগান্ধার নয়,
বাসন্তী-বিনিশা নয়, ক্ষুধা কিংবা ঘৃণা বলে ডাকি।
মাটির মূর্তির মতো ভেঙে ফেলি আঘাতে আঘাতে,
ঠোঁট থেকে ফিরাই চুম্বন, বাহুর বন্ধন থেকে ঠেলে দিই দূরে!
কে যেন ফেরায় তখন, প্রতিবাদ ওঠে অন্তঃপুরে।
আমি বুঝি, বড়ো লজ্জাহীন, কঠিন, নির্মম এই খেলা—
ভালোবাসা,—কী নাম তোমাকে দেবো?
তুমি তো আমারই নাম, আমারই আঙুলে ছোঁয়া
আলিঙ্গনে বন্ধ সারাবেলা।

রাজদ্রোহী

আমার রক্তের মধ্যে লোহিত কণার মতো মিশে আছে
পণিকার ঠোঁটের লিপস্টিক, ধবল শঙ্খের দাঁত খুলে খুলে
সাজানো চুম্বন। কোনো ব্যাধি তোমাকে ছোঁবে না।

আমি এই শতাব্দীর গণঘৃণ্য রোগের সন্তান,
কোনো পাপ আমাকে ছোঁবে না।
আমার হাতের মধ্যে বেচ্ছায় খুলে-দেয়া
বেশ্যার রাজদ্রোহী স্তনের গর্জন, কোলাহল,
কোনো শৃঙ্খল আমাকে ছোঁবে না।

আমার কণ্ঠের হাড়ে অহংকারী যুবতীর খোঁপার শেফালি,
মৃত্যুমাখা নীল-পাট আমাকে ছোঁবে না।
আমার মাংসের মধ্যে লাল ঘুণপোকা, ছিন্ন পেশী কণা,
কোনো প্রেম আমাকে ছোঁবে না।
কোনো মৃত্যু আমাকে ছোঁবে না।

সকল ফাঁসির রজ্জু জ্বলে যাবে প্রচুম্বিত কল্পনালী ছুঁয়ে,
ছিঁড়ে যাবে বেদনার ভারে, মৃত্যুদণ্ড আমাকে ছোঁবে না;
কোনো শৃঙ্খল আমাকে ছোঁবে না।

উল্টোরথ

শুধু চোখে নয়, হাত দিয়ে হাত,
মুখ দিয়ে মুখ, বুক দিয়ে বুক;
ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট খোলো, এইভাবে
খুলে খুলে তোমাকে দেখাও।

শুধু চোখে নয়, নখ দিয়ে নখ,
চুল দিয়ে চুল, আঙুলে আঙুল;
হাঁটু দিয়ে হাঁটু, উরু দিয়ে উরু,
আর এটা দিয়ে ওটাকে ঠেকাও।

শুধু চোখে নয়, চোখে চোখে চোখ,
বাহু দিয়ে বাহু, নাভি দিয়ে নাভি;
চাবি দিয়ে তালা খোলা দেখিয়াছি,
তালা দিয়ে খোলো দেখি চাবি?

প্রশ্নাবলী

কী ক'রে এমন তীক্ষ্ণ বানালে আঁখি,
কী ক'রে এমন সাজালে সুতনু শিখা?
যেদিকে ফেরাও সেদিকে পৃথিবী পোড়ে।
সোনার কাঁকন যখন যেখানে রাখো
সেখানে শিহরে, ঝংকার ওঠে সুরে।

সুঠাম সবুজ মরাল বাঁশের গ্রীবা
কঠিন হাতের কোমল পরশে জাগে।
দুখন ছাড়া কখনো বাঁচে না সে যে।
পুরুষ চোখের আড়ালে পালাবে যদি
কী লাভ তাহলে উর্বশী হয়ে সেজে?

বৈধ প্রেমের বাঁধন বোঝে না যদি,
কী করে এমন শিথিল কবরী বাঁধো?
চতুর চোখের কামনা মিশায়ে দুলে
রক্তপলার পাথর-বাঁধানো হার
ছিঁড়ে ফেলে দাও, স্বপ্নে জড়াও ভুলে।

কী ক'রে এমন কামনা-বাসনা-হারা
তাড়িত সাপের দ্বিরিৎ-ফণার মতো
আপন গোপন গহনে মিলাও ধীরে?
বিজলিউজল তিমির-বিনাশী শিখা
সেদিকে ফেরাও সেদিকে পৃথিবী পোড়ে।

সাহস

কেঁপে কেঁপে ওঠে খুনের সাহস :
'চুমু খেতে চাই'।
শূন্য পেয়ালা ভেঙেছে নেশার ঠোঁটে,
মিথুন ক্লান্ত করপুটে কাঁপে
স্তনের গুচ্ছ : 'চুমু খেতে চাই।'

দীর্ঘ শরীর চষে ফেলে চোখে
ফসল পাই নি,
শূন্য মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে
চিৎকার করি ব্যর্থ-কৃষক :
'চুমু খেতে চাই।'

কেঁপে কেঁপে ওঠে যুগলের স্পৃহা,
লক্ষ-যোজন পথ হেঁটে আসা
অবসাদ ঢাকে শেষ-হুংকার :
'চুমু খেতে চাই।'

একরাত্রি

তোমার ঐ পদ্মাসনে, পদতলে
মাথা রেখে একরাত্রি ঘুমোতে দিয়েছো।
তোরাকাটা শাড়ি পরে শিয়রে থেকেছো বসে
পোষমানা চিতার মতন।

এরকম মুগ্ধ-দৃশ্যে
অনুরাগে কেঁপেছিল ঘরের দেয়াল।
বাক্সবন্দ গীটারের তার সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে
উঠেছিল বেজে, ঐন্দ্রজালিক গানে,
পুরবীর সুরের ভাষায়।

বকুলের গন্ধে ভরা আসন্ন ভোরের
কুয়াশায় কিছু সুর অর্থ খুঁজেছিল,

বিন্দু শব্দ ছুঁয়েছিল প্রাণ।
যেন প্রকাশের তরে যত ফুটেছিল কথা,
যেমন না-বলা কথা যায় ফোটে
না-ফোটা কলির কথকতা।

তারপর রাত্রি শেষ হলো
বাদল-বাদলা-স্রোতে
ভেসে গেছে অন্যধুর কথা,
ঝর ঝর ফুলের কাঁপুনি।

এখন শব্দের চোখে চুমু দিয়ে
জাগাতে চেয়েছি তাকে ফের,
ছুঁয়ে ছুঁয়ে, স্পর্শ করে,
আঙুলের আলেখ্য খেলায়।
দীপের জ্বালেনি সুর, অবেলায়
যেতেছে শিকড় মুদ্রতোয়।

দীপ্তিমান ফোটায়ে ফেরালে,
জেগেছে শব্দের প্রাণে
প্রেম হয়ে, সুর হয়ে
দুরু-দুরু বুকের কম্পনে।

আমার বসন্ত

এ না হলে বসন্ত কিসের?
মনের ভিতর জুড়ে আরো এক মনের মর্মর,
পাতা ঝরা, হৃদয়ে হৃদয়ে লেখা চিঠি,—জোৎস্নায়
রাতের উদ্যানে কারো ধিক। এ না হলে বসন্ত কিসের?

পাতের কমনু ভেদ বেরিয়েছে অগ্নিবিন্দু রোদ,
বন ফুলে কুমারীর মুখ, প্রকৃতির প্রসন্ন প্রসূন।
কণ্ঠ ভরে কবি গায় পরিপূর্ণ সে গান বিশ্বের,
তাই পূর্ণ নিখিলে বিধুর। এ না হলে বসন্ত কিসের?

আশাহতি

জরা-মুক্ত হয়নি চিত্ত
অতীব বিলাসে কেটেছিলি।
সরসে ভুলেছে ছব, বারবার
কেটেছে অস্থির যুগে
শূন্য চিত্রপটে তুমি হীন।

অপরূপ বৈদ্যুতিক বিস্ময়
স্ত্রীলতা জাগেনি শব,
আমাদের অভিমুখী দুঃসাহসিক
অথচ জেগেছে কারো—;
সুপ্রভাতে, প্রিয়তমে
মুখর মৃণালে, প্রিয় নামে।

তোমাকে দেখেছি আলো
তীব্রতর বেদনার সাথে।
মৃত্যুর শিয়রে বসি
সেই প্রিয় মুখ যদি জানি
একদিন উৎসারিত প্রার্থনার ভাষা—
করেছিনু আশা, আজ পূর্ণ হবে।

আলোক কুসুম : নির্বাচিত বংশ

এইখানে আমি শব্দের ঘর বেঁধে
মধু মাটির সমুখে দীপের মতো
ক্লান্ত শিথিল সারাদিন ছিলো থেকে।
দু'টুটি বাহুর বাহুর আকর্ষণে
দু'টুটি উজল উর্বশী ইশারায়
মধুর মানসিক ছায়া এলো
জ্বলনি দিয়ে মাটির ভিতরে থেকে।
জেনো আহারে জাগাতে তুলিকা ফের
অতলস্পর্শে অবলীলায় থেকে।

কবিতা আমার এইখানে এসে দেখি
অতিমাত্রায় হয়ে গেছে শারীরিক।
শব্দ আমার, শত্রু আমার এ-কী?
মাংস আমার মজ্জা তোমারে ধিক্।

বীর্যেরা তোর সর্প বিষের মতো
নারীর ভিতরে তাকে কি মানায় বোকা?
তুই হবি তোর আত্মায় উপগত,
মানুষের মতো বিস্তৃতি কেন চাস?
নিজের ভিতরে তুই হবি তোর পোকা।

শব্দে ছন্দে রঙের তুলিতে তুই
আঁকিবি শুধুই পরমিলনের ছবি—,
নিজেকে ভাঙিয়া সৃজন করিবি দুই
মিলন চাহিয়া বিরহের মাঝে রবি।

এই হলো তোর নিয়তির অভিলাষ,
তোর বুকে এক অশরীরী চিতা জ্বলে
প্রত্যহ তার বেদনার কথা বলে
উজ্জয়িনীর পাহাড় ছাড়িয়া দূরে
যেতে হবে তোকে ভালবাসিবার ছলে।
হে কবি আমার, ভাগ্য আমার ওরে—
কবিতা এমনি করুণ দীর্ঘশ্বাস।

যখন ক্লান্তির করুণা বুকে নিয়ে
চাঁদের বোঝা বুকে আকাশ ঢল ঢল
তখন নিদ্রার প্রাত্যহিকতায়
কোমল কামনার বিছানা পাতা হল।

রাতের কালো ঘোড়া পরিল লাল টীপ
কপালে সিঁদুরের মালিনী জ্বলজ্বল,
বক্ষ বন্ধনী পরিয়া অলকার
আম্রপালি এসে দাঁড়ালো দরজায়।
তবে কি অবসিত রাতের জঙ্ঘায়
নারীর শয্যায় পুরুষ পরাজিত?

শুভ্র মণিজাল মগজ মন্থনে জাগিল ফেনসম মদিরে;
আপন উরুযুগে ঝরিল পয়োধারা, আহা কী অমৃত অপচয়।
ক্লান্ত কটিতটে ক্ষিপ্র কালো ঘোড়া লুকাল মুখ তার কেশরে,
হ্রস্ব হতে হতে দীর্ঘ ছায়াখানি যেনবা পদতলে অবনত।

এই তো আমি খুলে দিলাম বস্ত্র বাঁধন যতো
হ্রেষা আমার উত্তেজিত কালো ঘোড়ার মতো
লাফিয়ে ওঠে মধ্যরাতে আকাশটাকে ছুঁলো
ভালোবাসার স্বচ্ছজলে উৎসটাকে ধুলো।

এই তো আমি খুলে দিলাম চর্ম ঢাকা তনু
বীর্য আমার লক্ষ্যভেদী তীর সাজালো ধনু।
দুই উরুতে বন্দী ঘোড়া লুকালো লাল মুখ,
বরাহ কর্দমে যেমন রমণে উন্মুখ।

এই তো আমি খুলে দিলাম রক্তমাখা রতি,
গ্রহণ করো বীণাপানির জননী পার্বতী।
এই তো আমি খুলে দিলাম অস্থি ঢাকা প্রাণ,
গ্রহণ করো মজ্জা আমার অমৃত সন্তান।

গ্রহণ

ঘরের দেয়াল জুড়ে ছায়া ফেলে চাঁদের গ্রহণ।
রাতের উদ্বেল শিখা কেঁপে ওঠে শঙ্খিনীর মতো।
দীর্ঘ হয়। দীর্ঘ হতে হতে বক্র হয়। কে ওখানে?
উলঙ্গ মাংসের মূর্তি লাশঘরে হা-মুখে তাকায়;
মনে হয় প্রেতচ্ছায়া, যৌবনের কৃষ্ণ কাপলিক
গভীর অরণ্য ছেড়ে এসেছে পালিয়ে জনপদে।

দেয়াল ও ইটের মাঝে নিজের ছায়াকে দেখে
কেঁপে উঠি সামান্য নাড়ায়। কে ওখানে?
স্বগত সঙ্গীতে বাজে অনিঃশেষ রাতের কঙ্কন,
ঘরের দেয়াল জুড়ে ছায়া ফেলে অনির্দিষ্ট অমা।
বুঝি প্রেম পেয়েছে প্রাণের স্পর্শ,
অন্ধকার কামের গুহায় প্রবেশ করেছে প্রিয়তমা।

লিপিস্টিক

ট্যাকা কি গাছের গুডা?
নাকি গাঙের জলে ভাইস্যা আইছে?
এই খানকী মাগীর ঝি,
একটা টাকা কামাই করতে গিয়ে
আমার গুয়া দিয়া দম আয়ে আর যায়।
আর তুই পাঁচ ট্যাকা দিয়া
ঠোঁট পালিশ কিনছস কারে ভুলাইতে?
ক্যা, আমি কি তরে চুমা খাই না?
এই তালুকদারের বেডি, বাপের জন্মে
পাঁট ট্যাকার নুট দেখছস?
যা, অহন রিকশা লইয়া বাইরা,
আমি আর রিকশা বাইতে পারুম না।

বউটা ভীষণ ঘাবড়ে যায়!
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এগোয় রিকশার দিকে;
'তয় আমারে রিকশা চালানি শিখাইয়া দেও।'

রিকশাঅলা বউয়ের দিকে আচমকা তাকায়,
তার চোখ আটকে যায় বউয়ের পালিশকরা ঠোঁটে।
বুকের মধ্যে হঠাৎ করে ঝলক দিয়ে ওঠে রক্ত।
একটু আগেই যাকে তালাক দেবে ভেবেছিল :
'আয়, তরে রিকশা চালানি শিখাই', —বলে
সে তার সেই বউটাকেই চুলের মুঠো ধ'রে
হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে যায়
তার আপন গুহার দিকে।

ঘণ্টাখানেক ধরে বউকে সে রিকশা চালানি শেখায়।

বউ বলে : 'কী, অহন রাগ পড়িছে?'
রিকশাঅলা বউয়ের দিকে তাকায়,
চেনা বউটাকেও কেমন অচেনা মনে হয়।
ভাবে, আহা, পাঁচ ট্যাকার লিপিস্টিকেই অতো!
বড়লোকদের মতো যদি সে বউটার পেছনে
আরো কিছু ট্যাকা ইনভেস্ট করতে পারতো?

রমনা পার্কের হাওয়া খাওয়াবে বলে
সে তখন বউটাকে প্যাসিঞ্জার বানিয়ে নিয়ে
ছুটে যায় রমনা পার্কের দিকে।

সর্বগ্রাসী হে নাগিনী

আমি চালের আড়তকে নারীর নগ্নতা বলে ভ্রম করি।
রাজবন্দীর হাতের শৃঙ্খল আমার চোখের মধ্যে নারীর শাঁখার
মতো প্রেমের বন্ধন হয়ে কাঁপে, আমি ভ্রম করি।

যখন অগ্নির গ্রাসে এক-একটি সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে যায়,
আমি সে-ভস্মস্তূপের মধ্যে ঝলসে-যাওয়া শিশুর নিষ্পাপ মুখ
কিংবা সংসারের বিপুল বিনাশ দেখে আজকাল আঁতকে উঠি না।
শুধুই নারীর মৃত্যু সারাক্ষণ জুড়ে থাকে আমার হৃদয়।

এ কেমন নারী-গ্রাস?
এ কোন্ বিকৃত-বোধ আজকাল পেয়েছে আমাকে?
জনৈকা নারীর গর্ভে প্রথাসিদ্ধ কিছুটা সময় আমিও তো
করেছি যাপন, আমিও তো আপন বোনের পাশে একদিন
শয়ন করেছি, বসে বসে দেখেছি ধুলায় শিশুর উদ্ভাসনতা;
তারার শরীর ছুঁয়ে চোখে চোখে বেড়েছে বয়স।

তখন রমণী মানে আমুণ্ডু মথনযোগ্যা সর্বগ্রাসী নাগিনী ছিলো না,
তখন রমণী মানে রক্তকাঁপানো সুখে বুকে-মুখে চুমু খাওয়া
অফুরন্ত বাসনা ছিলো না, তখন রমণী মানে অন্যকিছু ছিলো।

এ কেমন নারী-গ্রাস?
এ কোন্ বিকৃত-বোধ আজকাল পেয়েছে আমাকে?
আমি চালের আড়তকে নারীর নগ্নতা বলে ভ্রম করি।
নারীর মৃত্যু ছাড়া কোনো মৃত্যু স্পর্শ করে না,
মাতা নয়, শিশু নয়, গণহত্যা নয়; কেবলই নারীর মৃত্যু
সারাক্ষণ জুড়ে থাকে আমার হৃদয়।

অগ্নিসঙ্গম

আমি কীভাবে অগ্নির সঙ্গে সঙ্গম করেছিলাম, সেই গল্পটা বলি।
একদিন ঝড়ের রাতে ঈশ্বর এসে উপস্থিত হলেন আমার ঘরে।
আমি সারাদিনের পরিশ্রম শেষে, তক্তপোষে আরাম করে শুয়ে
নিজের মনে, নিজের সঙ্গেই খেলা করছিলাম। আমার গাত্র
এবং মন উভয়ই ছিল নিরাবরণ। তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন
একটি চমৎকার দৃষ্টিনন্দন আলোকবর্তিকার রূপ ধরে এবং
গায়েবি ভাষায় বললেন : 'আমি আপনাকে শিশ্নমুক্ত করতে এসেছি,
দয়া করে আপনি দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।'

আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, তাই যেভাবে শুয়েছিলাম,
সেরকম শুয়ে থেকেই বললাম : 'খুব ভালো কথা, কিন্তু
আমি কি জানতে পারি, কী আমার অপরাধ?'

ঈশ্বর বললেন : 'হ্যাঁ, পারেন। আপনি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রটিকে সৃষ্টির চেয়ে
অনাসৃষ্টির কাজেই বেশি ব্যবহার করেছেন। আপনি সামাজিক
নিয়ম-কানুন এবং স্থান-কাল-পাত্রের ভেদ মান্য করেন নি।'

তাঁর কথা শুনে আমার খুবই রাগ হলো। এ কি ঈশ্বরের যোগ্য কথা?
নিয়ম-কানুন, স্থান-কাল-পাত্রভেদ, মানে? তিনিও যদি মানুষের
মতোই কথা বলবেন, তা হলে আর ঈশ্বর কেন? একটু রাগতস্বরেই
আমি বললাম : 'আপনি কি জানেন না, আমি অভেদপন্থী?'

ঈশ্বর বললেন : 'জানি। আমি ভুল করে আপনাকে অসময়ে
পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম। আপনি আদিমকালের মানুষ;
এ-যুগ আপনার নয়। আমি আপনার প্রতি সম্মানবশত আপনাকে
উঠিয়ে নিতে নিজে এসেছি এজন্যে যে, আপনি আমার প্রিয়-কবি,
অন্যথায় আমি আমার যমদূতকেও পাঠাতে পারতাম।'

আমি বললাম : 'বেশ, ভালো কথা। কিন্তু ভুলটা যেহেতু আমার নয়,
আপনার, তাই আমার একটা শেষ-শর্ত আপনাকে পূরণ করতে হবে,
তারপর আমি আপনার কথা রাখবো।'

'বলুন কী শর্ত!' —ঈশ্বর জানতে চাইলেন।
আমি আমার দীর্ঘ লালিত একটি গোপন স্বপ্নকে মনের অতল থেকে

মুক্তি দিয়ে, কামানাজড়িতকণ্ঠে বললাম :
'শুধু একটি বারের জন্য আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চাই।'

মনে হলো, আমার প্রস্তাব শুনে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে
আলোকবর্তিকাটি ঘূর্ণিহাওয়ায় দুলে উঠলো।

স্থির হলে পর, গায়েবিভাষায় ঈশ্বর বললেন : 'আমি অন্তর্যামী,
আমি আপনার এ-আকাঙ্ক্ষার কথা অনেক পূর্ব থেকেই জানি,
কিন্তু তা কখনই পূরণ হবার নয়। আমি নারী, পুরুষ বা কোনো
সঙ্গমযোগ্য প্রাণী নই, —আমি হচ্ছি অগ্নি, সর্বপাপঘ্ন অগ্নি আমি,
আমি নিশ্ছিদ্র। আপনি আমার সঙ্গে মিলিত হবেন কী ভাবে?'

আমি বললাম : 'সে ভাবনা আমার, আমি আমার প্রবেশপথ
তৈরি করে নেব। আমি শুধু আপনার সম্মতিটুকু চাই।'

ঈশ্বর বললেন : 'সাবধান, আপনি আমার দিকে অগ্রসর হবেন না।
আর এক পা-ও এগুবেন না, ভস্ম হয়ে যাবেন।'

প্রজ্বলন্ত আলোবর্তিকার মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করে আমি বললাম :
'ইতিপূর্বে বহুবার, বহুভাবে আমি ভস্ম হয়েছি, ভস্মের ভয় দেখিয়ে
আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করছেন কেন? —আমি চাই আপনিও
আমার আনন্দের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করুন।'

নায়াগ্রা প্রপাতের অফুরন্ত জলধারার মতো আমার স্খলিত দীর্ঘধারায়
যখন শীতল হলো আলোকবর্তিকার সেই অগ্নিজ্বলা দেহ,
তখন গায়েবিভাষা রূপান্তরিত হলো মধুক্ষরা মানবীভাষায়।
ঈশ্বর বললেন : 'আমাকে অমান্য করার অপরাধে, দেখবেন,
একদিন আপনার খুব শাস্তি হবে।'

আমি অপসৃয়মাণ সেই আলোকবর্তিকার দিকে তাকিয়ে বললাম :
'কুচযুগ শোভিত, হে অগ্নিময়ী দেবী, তবে তাই হোক।'

অন্ধকারের আলোয়

হালকা মেঘের মত অন্ধকার উড়ছে পলাশীর প্রান্তরে।
বুঝি শীত পড়তে আর খুব বেশি দেরি নেই; তাই
অন্ধকারের মধ্যে যুক্ত হয়েছে বাতাসের চেয়ে হালকা
ধোঁয়ার চরিত্র। আমি কি পাহাড়চূড়ায় বসে আছি?
না, একবার দার্জিলিং বা মংপুতে না গেলেই নয়।
সমতলের রমণীদের সঙ্গে আর কোনো সঙ্গম নয়,
এবার আমি মিলিত হবো অন্যরকম মেঘের সঙ্গে।
কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফশুভ্র স্তনের ভাঁজে মুখ ঢেকে
শীল মাছদের মতো নিশ্চিন্তে ঘুমুতে চাই আমি।

কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময়
কাল সন্ধ্যায় আমার চোখ পড়েছিল শেফালি গাছে।
পোঁয়াতিদের মতো পাতায় ক্লোরোফিল মেখে
ফুল ফুটানোর জন্য ক্রমশ প্রস্তুত হচ্ছে তারা।
সাবাস শেফালি, তোমরাই ভালো আছো।
জৈবদোষে, ইতর প্রাণীদের মতো তোমাদের তো
স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে সঙ্গম করতে হয় না।
তোমাদের ফুল ফোটানোর পদ্ধতিটা ভালো।

একটু পরেই আমি মিলিত হবো এক নারীর সঙ্গে।
বড় রকমের দলাই-মলাইয়ের পর অগোচরে,
আমাদের দু'জনের পাকস্থলির ভিতর থেকে
একসময় কৃমিকীটগুলো বাইরে বেরিয়ে আসবে।
অন্ধকারের আলোয় তারা তাদের প্রথায়
ভাব বিনিময় করবে নিজেদের মধ্যে।
আমি তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখবো তাদের সঙ্গম।

ভোরকে ধারণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আকাশ।
ছিঁড়ে-যাওয়া মালার সোনালি পুঁতির মতো
সূর্যের গণ্ডদেশ থেকে এখন গড়িয়ে পড়বে আলো।
দিনজাগা মানুষেরা এসে ক্রমশ দখল করে নেবে
রাতজাগা জোনাকিদের হারানো পৃথিবী।

অন্ধকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবার জন্য
আমি এখন ভান করবো নিদ্রার।

বহুগামীর স্বীকারোক্তি

যৌবন শুরুতে খুব সাধারণ মানুষের মতো
অভ্যাসবশত নারীকে আপন ক'রে পেতে
আমি একবারই চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি।
সেই থেকে আমি প্রেমছুট, মুক্ত প্রজাপতি।

কতো নারী-সরোবরে থেমেছে আমার রথ,
কতো ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়েছে জীবন।
কম ভালোবাসার কৌশল কেন যে শিখিনি?
যখন পড়েছি প্রেমে পাগলের মতো পড়েছি।
বহু-জীবনের বহু-বাসনায় আমি বহুগামী।

তবে আমি একা বহুগামিতার ভূতে-পাওয়া
এক কামাতুর কবি, একথা বিশ্বাস করি না।
জানি জীবনমাত্রই বহুগামী, স্বভাবে, স্বজ্ঞায়।
পরমহংসদেব বা ঋষি বিবেকানন্দের মতন
আত্মপীড়ন রণে পারদর্শিতা করিনি অর্জন।
মন স্থির করা হয়তো সম্ভব অদৃশ্য ঈশ্বরে,
কিন্তু অসম্ভব জীববংশে, —নারী কিম্বা নরে।

টুথব্রাশ

বেসিনে ফুলের মতো ফুটে আছো লাল টুথব্রাশে,
তোমার রক্তিম মাড়ী, বিবসনা ঔষ্ঠ মনে আসে।

বালতির ভেজা শাড়ি জলের ভিতর থেকে তুলে ধরে
জর্জেটের পাড়, তারো আছে ভালোবেসে বেদনা অপার।

সাবানে জড়ানো চুল নিজের অজান্তে খুলে জড়াই আঙুল।
বাথটাবে ভালোবাসা ফুল হয়ে ভাসে, তুমি নেই,
তোমার না-দেখা মুখ দেখে আসি লাল টুথব্রাশে।

হে অনন্ত আনন্দউদ্যান

আমি কি জানি না, এই বৈরি পৃথিবীতে
শুধু তুমি ছাড়া কতটা দুর্লভ ছিল সুখ?
আমি কি জানি না, এই নিস্তরঙ্গ অকূল পাথারে
তুমি ছাড়া কতটা অসহ্য ছিল বাঁচা।

আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি তোমাকে—
যতক্ষণ জাগ্রত থাকো তুমি,
ততক্ষণই আনন্দ আমার।
ঠিক ততক্ষণই আনন্দ আমার।

যখন জাগ্রত হও তুমি, আমি মৃত্যুকে মথন ক'রে
জীবনের বিষপাত্রে খুঁজে পাই রতিশুভ্র ননীর সন্ধান।

আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি তোমাকে,
যখন ঘুমিয়ে পড়ো তুমি—তখন আমার দেহে
প্রাণের আনন্দ বলে কিছুই থাকে না।
শুধু অকারণ, অর্থহীন জীবনের তুচ্ছতার গ্লানি
ছুটে এসে বেদনার বেশে জড়ায় আমাকে।
তখন আমাকে আমি চিনতে পারি না।

আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি তোমাকে,
যখন জাগ্রত থাকো তুমি, সমকামীদের মতো
পুরুষকেও ভালোবেসে আমি আদর করতে পারি।
আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি তোমাকে,
যখন জাগ্রত থাকো তুমি বাঘিনীর হা-করা মুখেও
আমি চুম্বন করতে ভয় করি না।

যখন জাগ্রত থাকো তুমি, অবলার অগম্যবিবরে
কী ভালোবেসেই না প্রবেশ করে আমার জিহ্বা।
তখন আমার ভিতরে ঘৃণা বলে কিছুই থাকে না।
আমি প্রেমিকার পায়ুপথে নাক গুঁজে খুঁজে পাই
এক অপার্থিব অর্কিডের ঘ্রাণ।

হে পয়মন্ত যৌবন আমার, হে অন্তত আনন্দউদ্যান,
বলো, তুমি কক্‌খনো ছেড়ে যাবে না আমাকে!

এই আঁধারনিমগ্ন রজনীতে

প্রতিবন্ধকতাহীন এই আঁধারনিমগ্ন রজনীতে,
গ্রীষ্ম-অবসানে, আষাঢ়ের সিক্ত-অশ্রুজলে—
আজ আমি তাকে পেয়েছি নির্ভুল করতলে।
প্রথম কোথায়, কবে ফুটেছিল এই বন্যফুল,
সে-কথা জানার আমার কোনো দরকার নেই।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে এতোদিন ফুটেছে সে
নিজের ভিতরে, আত্মমগ্ন, আপন খেয়ালে;
সেখানে আমার কোনোই ভূমিকা ছিলো না।
আজ তার সাথে যুক্ত হবে আমার স্বভাব।

আমি আজ প্রবেশ করবো ফুলের ভিতরে,
আজ রাতে আমি তাকে সামান্য ফোটাবো।

আত্মজীবনী : তৃতীয় খণ্ড

আমি দশদিগন্তে দশ নারীকে নিয়ে শুই।
আমাকে তারা ঘিরে রাখে কাঠমুণ্ডুকে যেমন পাহাড়।

আমার উত্তরে গৌরী, দক্ষিণে কল্পনা;
পূর্বে পবিত্র গীতা, পশ্চিমে পাবক।
আমার ঈষাণে উর্বশী দেবী, নৈর্ঋতে নির্ঝর।
বায়ুকোণে ভালোবাসা, অগ্নিকোণে ছায়া;
অধোকোণে মণিরত্না, ঊর্ধ্বকোণে মায়া।

এদের আবার প্রত্যেকের একাধিক যোগিনী রয়েছে।
আমাকে তারা আগলে রাখে যাবতীয় বদরশ্মি থেকে
যেমন ওজনছাতা পৃথিবী নামের এই ছোট্ট-গ্রহটিকে।

এর পরও আমার ভয় কাটে না, মনে হয় এই বুঝি
দুর্নীরিক্ষ্য ছিদ্রপথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে যম।

বর্ষার সঙ্গে আমার সম্পর্ক

আমার চাইতে বর্ষারানীর বয়স অনেক বেশি।
তার সঙ্গে আমার বয়সের যে পার্থক্য, তাতে
প্রাচ্যনিয়মমাফিক আমার পক্ষে সঙ্গত হতো
তাকে শ্রদ্ধা করে 'আপনি' বলে ডাকা; কিন্তু
আমি তা বলি না, আমি বর্ষাকে বলি 'তুমি'।
তবে, আমরা যখন শিক্ষিতের মাহফিলে যাই,
ভদ্রলোকদের সামনে, পূর্বসিদ্ধান্তমতোই আমি
বর্ষাকে আপনি ইনি উনি বলে সম্বোধন করি।

রাতে সঙ্গমকাতর হুলো বিড়ালের ডাকে যখন
লম্ফ দিয়ে ওঠে রক্ত, —যখন গুহায় ফিরে যাই,
তখন ঐ সব সম্বোধনের কোন বালাই থাকে না।
অরণ্য কাঁপানো উষ্ণ হস্তির মতো আমি তখন
আকারে ইঙ্গিতে আমার প্রিয় হস্তিনীকে ডাকি,
তার ঘনকৃষ্ণমেঘজালে যুক্ত করি আমার শুঁড়।
আমি অতো প্রথাসন্ধি সঙ্গমের নিয়ম মানি না।

আমি জানি, ভদ্র দিনের কথা ভেবে
প্রতিদিন হাসে নগ্ন অভদ্র রজনী।

এখন ঐ বর্ষারানীই আমার যৌনজীবনসঙ্গিনী।
মূর্তি গড়বার আগে মাটি ছানবার মতো, যখন
বর্ষারানীকে আমি পদতলে ছানি, তখন হঠাৎ
আমার মনেও প্রশ্ন জাগে, হায় এটা কি উচিৎ?
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথসহ অজস্র অগ্রজ কবি
সশ্রদ্ধ দূরত্ব রেখে বন্দনা গেয়েছেন যে-ঋতুর,
আমি কিনা সর্বজনগণমান্য সেই বর্ষারানীকেই
মত্তহস্তিবৎ হস্তপদশুঁড়কামে পিষ্ট করিতেছি।

ভাগ্য ভালো, মনুষ্য-বিবাহপ্রথা বর্ষা জানে না।
সে ভালোবাসে উন্মুক্ত বিহার, গগনে গর্জন।
তবে সিঁদুরে মেঘের প্রতি তার টান আছে বলে
আমি তাকে পরিয়েছি বজ্রচেরা মেঘের সিঁদুর।

উন্মুক্ত সঙ্গম হেতু আমার ঔরসে, ঐ বর্ষা-গর্ভে
সম্প্রতি একটি মেঘবর্ণ পুংলিঙ্গের জন্ম হয়েছে :
ভালোবেসে আমরা তাহার নাম রেখেছি, শরৎ।

তার স্তনশোভা

তার স্তনশোভা চোখে নিয়ে মার্কিনদেশে ভ্রমণে গিয়েছি।
সাগর, পর্বতমালা, বনবীথি আর ঝুলন্ত আকাশমেঘদল
অপার সৌন্দর্য নিয়ে বার বার উড়ালপথে উদয় হয়েছে।
চন্দ্রকিরণস্নাত বোয়িংবিমান গগনসঙ্গম শেষে নিতম্বিনী
বিমানবালাদের উগলে দেবে বলে নামিয়াছে সিঙ্গাপুরে,
প্রশান্ত সমুদ্রতীরে, নারিতায়, সব-শেষে লস এঞ্জেলেস।

প্রকৃতির সাথে পাল্লা দিয়ে পৃথিবীবিখ্যাত নগরে-নগরে,
প্রাসাদপ্রতিমাগুচ্ছে মাথা তুলিয়াছে মনুষ্যনির্মিত শোভা।
তার সুমসৃণ হাইওয়ে বিমুগ্ধ করেছে চিত্ত গতির পুলকে।
আমি তার চেয়ে সুমসৃণ নারীদেহ দেখিয়াছি নাইটক্লাবে,
দেখেছি তাদের সযত্ন-বর্ধিত স্তন, ডলারের তলা থেকে
মেঘ ফুঁড়ে চাঁদের মতোন ঝলমল করে উঠেছে আলোয়।

অথচ কী আশ্চর্য! আমার দু'চোখ থেকে মুহূর্তের জন্যও
আমি ঐ অযত্ন-বর্ধিত স্তনের শোভাকে তাড়াতে পারিনি।

প্রকৃত সঙ্গম

তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় আমি কখনও তোমাকে এমন
কোনো শর্ত দিইনি যে, আমার এই মানুষী-আকৃতি তোমার অক্ষুণ্ন
রাখতে হবে; বরং তোমার কাঠগড়ায় আমার দেহকে সমর্পণ করার
সময় উপর্যুপরি আমি তোমাকে বলছি এসো, হে সর্বগ্রাসী নাগিনী
আমার, রুদ্ররূপে আমার বিরুদ্ধে তুমি তোমাকে প্রকাশ করো।
তোমার অমিত-দণ্ডের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করে, তুমি আমার
পুরুষকারকে করুণা করো না। দীর্ঘ-দীর্ঘ অপেক্ষার পর, তোমার
সঙ্গে আমার এই মিলনকর্ম যখন সংঘটিত হচ্ছেই, তখন মিলন-শেষে

আমি আমাকে পুনরায় পূর্বরূপে ফিরে পাবো, এমন প্রত্যাশা করি না।

তোমার আনন্দের প্রয়োজনে, ঘূর্ণিঝড়ের মুখে কচি-কলাপাতার
মতো তুমি আমাকে ছিন্নভিন্ন করো; বিস্ফোরিত কোমলতার চতুর
আঘাতে পলকা কাচের মতো আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করো তুমি।
হৃৎ-প্রকৃতির পাশাপাশি দেহের আকৃতিকেও যে পরিবর্তন করে না;
আমি তাকে প্রকৃত সঙ্গম বলি কী করে?

আমার পৃথিবী

সাপের ফণায় নয়, রমণীর স্তনাগ্র চূড়ায় স্থির
আমার পৃথিবী; অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী।

আমি সেই পৃথিবীকে প্রতিদিন কুরে কুরে খাই,
খুঁটে খুঁটে খাই, অর্থাৎ আমাকেই খাই।

ছিন্ন করে মাংসতন্তুজাল

তোর সঙ্গকাতর অঙ্গভঙ্গিগুলি তুই ফুটিয়েছিলি আমার জন্য।
এই বাণপ্রস্থে এসে যখন আমার সঙ্গমত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণের
কথা, তখন হঠাৎ ইন্দ্রের রাজসভা থেকে নৃত্য করতে-করতে
বেহুলার মতো তুই এসে লুটিয়ে পড়লি এই মর্ত্যের মাটিতে।

তরুণের মতো তরুণ উল্লাস নিয়ে এখন যখন আমি তরুতলে
বসে তোর উলঙ্গ শরীরে উলাল করি আমার উলঙ্গ আত্মাকে;
যখন প্রবীণ স্পর্শের শিহরনে তোর নবীন শিখরে লাগে দোলা,
রক্তমাখা অন্ধকারে যখন ছিন্ন হয় তোর মাংসতন্তুজাল, তখন
তোর বিবস্ত্র শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হয় নৃত্য, নবকাব্যভাষা।

মন তো সামান্য বস্তু আমার তখন প্রাণ ঢেলে দিতে সাধ হয়।

আমিও উন্মাদ হতে চাই

আমার জগৎ খুব সীমাবদ্ধ, বড়জোর বঙ্গদেশ,
তাঁর সৃষ্ট জগতের পরিধি এবং প্রকৃতি বিপুল।
আমি সেই সুন্দরের সামান্যই দেখেছি জীবনে,
তাতেই আমার মন রূপে-রসে পাগল হয়েছে।

অঙ্গুলি হেলনে নিত্য যাঁর পায়ে লুটায় সুন্দর;
তিনি স্থির থাকেন কীভাবে, বুঝতে পারি না।
তিনি সুস্থ, স্বাভাবিক কোন পাগলে বলেছে?
তিনিও পাগল, সুন্দরের লাগি তিনিও উন্মাদ।

অন্যথায় তিনি কেন এরকম সুন্দর ও লাগসই
করে নারী-দেহ গড়বেন, আমি বুঝতে অক্ষম।
পরমকরুণাময় হে ঈশ্বর, আমাকে সক্ষম করো,
তোমার সৃষ্টির মারপ্যাঁচ কিছু আমাকে শেখাও।

নারীদেহ ভালবেসে আমিও উন্মাদ হতে চাই।

আমার জন্য নয়

নগ্ন অবস্থায়, কম্পিউটারের স্ফটিকস্বচ্ছ পর্দার সামনে বসে,
কী-বোর্ডের ভ্যাসিলিন-পিচ্ছিল অক্ষরসন্ধিতে দক্ষিণহস্তের
অঙ্গুলি চালনা ক'রে কবি এই কবিতাটি রচনা করেছেন।
নারীর ঐশ্বর্যভোগের অভিজ্ঞতাকে ভাগ করে নেবার জন্য,
এই কবিতার রচয়িতা এই কবিতাটি রচনা করেছেন
তার অতি-সাম্প্রতিক যৌন-সহচরীকে নিয়ে।

শিল্পসৃষ্টির জন্য সহচরীর সদ্যমেদজাগ্রত কটিবেষ্টনকারী
কালো-করদনিটিকেও খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে।
'নগ্ন' শব্দটির মতোই সে এখন সম্ভাব্য সকল অর্থে নগ্ন।
সে জানিয়েছে, মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর থেকে
এর চেয়ে বেশি নগ্ন সে আর কখনও হয়নি;
কিছু না কিছু বস্ত্র, কোনো-না-কোনো সৌন্দর্যবর্ধকসামগ্রী,

কোনো-না-কোনো ফর্মে তার দেহে সর্বদাই অবশিষ্ট ছিল।
আজই তার ব্যতিক্রম ঘটলো। আমি বিশ্বাস করি তাকে।
কেননা, আকাশের চাঁদ, পালিত কুকুরছানা এবং টবের প্রিয়
ফুলের চারার মত সে বড় হয়েছে আমার চোখের সামনে।
শামুকের খোলশ খোলার মতো যখন একটু একটু করে
সে খুলতে চাইছিল নিজেকে; তখন আমি তাকে নগ্ন করেছি
গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে, সরাসরি চিতায় তোলার মতো।
এখন আমরা চিতার আগুন প্রজ্জ্বলিত হওয়ার অপেক্ষায়।

আমার জন্য নয়, এসবই করা হয়েছে আমার কবিতার
খুব নির্বাচিত কিছু পাঠকের কথা ভেবে।
আমি জানি, তাদের নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।
নারী সম্পর্কে জানার জন্য তারা আমার ওপর নির্ভরশীল।

স্বচ্ছ জলছাপের মতো এ-কবিতার মধ্যে যে-নগ্নিকাকে
আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তার বর্ণজ্ঞানবর্জিত সঙ্গমক্লান্তদেহ
এখন কবির দেহের ওপর একেবারে যম-ঘুমে আচ্ছন্ন।
এখন কৃষ্ণ-অজগরীর দখলে দলিত তার রবীন্দ্রগৌর দেহ।
সর্বগ্রাসী সর্পিনীর আলিঙ্গনে সমর্পিত ঐ কবি এখন
সৈকতে বিশ্রামরত জেলী-ফিসের শুভ্র-স্তব্ধ-স্তন ও নিতম্বের
স্পঞ্জ-কোমলতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্রয় নগরীর অবর্ণিত আনন্দকে
প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন।

কবির ইনসমনিয়া, ক্লান্তি এলেও সহজে ঘুম আসে না।
পক্ষান্তরে দীর্ঘবিহারে অক্ষম রমণীটি খুবই ঘুমকাতুরে।
ভোররাতের দিকে পুনর্বার কামজ্বরে জাগ্রত হন ঐ নারী।
কবি অজগরীর ঐ অভ্যাসের কথা জানেন, —তাই, তাকে
বুকে জড়িয়ে নিয়ে তিনি জেগে আছেন ভোরের আশায়।
ভোরের দিকে, অন্ধকারকে নিচে ফেলে, কৃষ্ণবর্ণ গ্রাস করে
ক্রমশ উপরে উঠে আসবে গৌরবর্ণের রাবীন্দ্রিক-আলো।

রাসকলনিকভের স্বীকারোক্তি

আমি জানি পলিনোভা, তুমি আমার প্রেমিকা ছিলে না,
আমিও তোমার কাছে প্রার্থনা করিনি প্রেম।
তবে এ-কথা ঠিক, তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম।
সে-ভালোবাসায় প্রবৃত্তির দুর্বৃত্ত—বাসনা ছিল না,
ছিল আচার্যের ধ্যান, যা দিয়ে তিনি নির্মাণ করেন দুর্গা।
তোমাকে পবিত্র অগ্নিতে পরিণত করার জন্যই
আমি তোমার ভেতরের অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছিলাম
ঘৃতের আহুতি দিয়ে, কেননা আমি জানতাম,
তোমার অগ্নিই হবে আমার শেষ-আশ্রয়।
ভালোবাসা ছাড়া তোমাকে নির্মাণ করার আর কোনো
সহজ উপায় আমার জানা ছিল না। পলিনোভা,
আমার ভালোবাসার অপরাধ ক্ষমা করো, প্রিয় আমার।
আমি রাসকলনিকভ, অপরাধী, অদৃষ্টতাড়িত এক কবি,
কাকডাকা ভোরের সকালে ছুটে এসেছি তোমার কাছে,
হে পবিত্র অগ্নি আমার, তুমি শ্রবণ কারো আমাকে।

আমি ছিলাম একই সঙ্গে লিবিডোতাড়িত
এবং প্রভাবিত পরিপার্শ্ব দ্বারা।
একই দেহে আমি ধরণ করেছিলাম
পরস্পর-বিরোধী জীবন।
পলিনোভা, হে প্রিয় আমার,
তুমি আমাকে শ্রবণ করো,
যজ্ঞের অগ্নি যেমন শ্রবণ করে
পুরোহিতের কণ্ঠোচ্চারিত বেদমন্ত্র।

আমি বড়রকমের কোনো অর্থনৈতিক অপরাধ করি নি।
পলিনোভা, প্রিয় আমার, আমি স্বীকার করছি,
আমার গুরুত্বপূর্ণ অপরাধসমূহের প্রায় সবই
সংঘটিত হয়েছে আমার যৌনজীবনে।
আমি তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করবো তা।

আমি ছিলাম আদিম কৌমসমাজের মানুষ,
তাই প্রবৃত্তির হাতে সঁপে দিয়েছিলাম নিজেকে।

আমার প্রথম নারীসঙ্গমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল
আমার এক দিদির সঙ্গে। সেই আদিপাপ হেতু
পলিনোভা, তুমি আমাকে দন্ড দান করো।

এক অন্ধকার অমাবস্যার রাতে আমি মিলিত হয়েছিলাম
উন্মুক্ত আকাশতলে, স্বামীর শয্যা থেকে পালিয়ে-আসা
এক কৃষকবধূর সঙ্গে; স্বামীর দৃষ্টি থেকে আমি তাকে
আড়াল করে রেখেছিলাম, কবরের মাটি যেমন আড়াল করে
রাখে লাশ। দণ্ড দাও পলিনোভা, আমাকে দণ্ড দাও।

আমার উচিত ছিল গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই
তাদের শ্রমের মূল্য শোধ করা কিন্তু আমি তা করি নি।
একপর্যায়ে তাদের পাওনা শোধ না করেই আমি
উঠে এসেছিলাম নগরীর এই ভদ্রপল্লীতে, পলিনোভা,
বারাঙ্গণাদের হয়ে তুমি আমাকে শাস্তি দান করো।

দূর পথ পাড়ি দিয়ে উড়ে এসেছিলা এক রাজকন্যা।
তার রূপ ছিল শারদসকালে জলপদ্মের মতো,
আমি ভালোবেসে তার নাম দিয়েছিলাম রাঙা-কালী।
সে ধরা দিয়েছিল আমার চৈত্রের ভালোবাসায়।
আমার কর্তব্য ছিল যে-পর্যন্ত না সে ফিরে আসছে,
সে পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষায় থাকা ...
কিন্তু হায় ঈশ্বর, আমি তার জন্য অপেক্ষা করি নি।

আমার রক্তে ছিলো সর্বগ্রাসী নাগিনীর ক্ষুধা,
আমি রাসকলনিকভ, অভিশপ্ত লোভী আত্মা এক;
নিত্যনব নারীচিত্ত জয়ের অহংকারে,
আমি অমর্যাদা করেছিলাম তার ভালোবাসাকে—।
তাই অদৃষ্টের রূঢ় দণ্ড আমি এড়াতে পারি নি।

পলিনোভা, হে নৃমুণ্ডধারিণী দেবী,
হে সতীশ্রেষ্ঠা বারাঙ্গনা, আমার আত্মার
শুদ্ধির প্রয়োজনে তুমি আমাকে পোড়াও।

কবির অগ্নিকাণ্ড

খুব ছোটোবেলায়, আমি খুব বড় একটি
অগ্নিকাণ্ড দেখেছিলাম। গোপালপুর বাজারে,
ভগবান সাহার চারটি পাটের গুদাম চারদিন ধরে
সেই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছিল।

অন্যদের কাছে যাই হোক, ঐ চারটা দিন
আমার কাছে ছিল খুবই আনন্দের।
কাছেই নদী থাকার পরও, গোপালপুরের মানুষ,
নদীকে উপহাসকরা লেলিহান শিখাসমন্বিত
প্রবল অগ্নির কাছে পরাভূত হয়েছিল সেদিন।

চতুর্থদিনের মাথায়, দাহ্যবস্তুর অভাবে
অগ্নি যখন নির্বাপিতপ্রায়—তখন সেই অগ্নির দিকে
তাকিয়ে, আমার রক্তের ভিতরে পদ্মকুঁড়ির মতো
জাগ্রত হয়েছিল এক অনন্ত অগ্নির বাসনা।
আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম,
বড় হলে তিনি যেন আমার ভিতরে
অগ্নি সৃজনের কৌশল দান করেন।
ভগবান আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।
তাই, যৌবনে, আমার রক্তের তিরে
অজস্র ডালপালা মেলে পল্লবিত হয়েছিল
আমার প্রার্থিত অগ্নিশিখা।

মানি, অন্যকে পুড়িয়ে নিজের রূপ ও শক্তিকে
যে প্রকাশ করে, সে নিষ্ঠুর।
কিন্তু ঐ দিকটা আমার তখন চোখে পড়ে নি।
আমি শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম তার রূপের
সুবর্ণ-শিখার উল্লাস।

নির্বাপিত হবার পূর্ব-মুহূর্তে, দাহ্যবস্তুর কাছে
অগ্নি ক্ষমা চায় কি না, আমি বলতে পারবো না।
কিন্তু আমি আজ নত মস্তকে ক্ষমা চাইছি।
ক্ষমা চাইছি এ জন্য যে, ঘৃণার অগ্নিতে আমি

যে-সব অশুভকে পোড়াতে চেয়েছিলাম,
তার একটিও আমি পোড়াতে পারি নি; কিন্তু
কবির অহংকে পূর্ণ করতে গিয়ে, ভালোবাসা ও
যৌন-কামনার অগ্নিতে আমি বহু-রমণীর
পবিত্র হৃদয়কে দগ্ধ করেছি।

মুন্নীর জন্য কয়েক পঙক্তি

তোমার প্রাপ্য প্রশংসা যদি কেড়ে নিতে পারো, নাও,
হে গরবিনী, আমি তো আমার দু'চোখ খোলাই রাখি।
নবআনন্দে পাপড়ি-খোলার মতো বিকশিত কর যদি
দীর্ঘ অঙ্গশোভা, রূপের গোত্র বিবেচনা হবে তখনই,
তবে আমি যে মুগ্ধ বস্ত্র-বিরোধী, জানো না তা-কি?

টিয়া রঙ শাড়ি, পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করে পরা জামা,
জানি এর সবই বিপণীলব্ধ, শুধু তুমিই তুলনাহীনা।
কপালের টিপ সাগরে সূর্যোদয়; ভালো তো বটেই,
সন্দেহ নেই, কিন্তু কী করে বুঝবো, বাইরে যেমন
ভিতরেও তুমি ঠিক সেরকমই অগ্নিস্বরূপা কি-না?

বঙ্গের নারী, অঙ্গের শোভা আড়ালে স্বস্তি খোঁজে,
তাইতো কবির কল্পনালোকে বাড়ায় উপরি চাপ।
এর চেয়ে ভালো নয় কি সহজে সহজ কথাটা বুঝে
সহজিয়ারূপে সাজা? হে প্রিয় নবীনা, দেখাবেই যদি
এসো নিরাবেশে, ঝড়ের হাওয়ায় উড়িয়ে মনস্তাপ।

কবির আসল খেলা

'দ্যাখ, একটুও বেয়াদবি করবি না কিন্তু,
জোরাজুরি করলে আমার কিন্তু খুব রাগ হয়।'
'ছাড়েন তো, আপনিও জোরাজুরি করবেন না,
জোরাজুরি করলে আমারও খুব রাগ হয়?'
এই বলে, কবিকে মাটিতে ঠেলে ফেলে দিয়ে,

তার আলিঙ্গন ছিঁড়ে মেয়েটি বেরিয়ে যায়।

কবি একবার ভাবেন, গণতান্ত্রিকভাবেই তিনি
মেয়েটিকে অঙ্কশায়ী করবেন, আবার ভাবেন
শক্তিপ্রয়োগ ছাড়া আত্মত্যাগ কে কবে করেছে?
শেখ হাসিনার আন্দোলন তাঁকে প্ররোচিত করে।
কবি বলেন, 'আমার মতো তোরও রাগ হয়?'

এবার মুক্তি পাবে, এমন আশায় বুক বেঁধে,
মাথা উঁচু-নিচু করে মেয়েটি বলে, 'হ। হয়।'
'তাহলেই দ্যাখ, রাগ তোরও হয়, আমারও হয়,
তাইতো বলি, তোর সঙ্গে আমার কতো মিল!'

কবি ভাব দেখান, যেন এইমাত্র তিনি
একটি প্রিয় শব্দের অন্ত্যমিল খুঁজে পেয়েছেন।
কবির কথায় মেয়েটি আকাশ থেকে তারার মতো
মর্ত্যের মাটিতে খ'সে পড়ে। —এ কেমন কথা?
মিল? এখানে মিলের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?

একটু আগেও কবির কোলে নিজদেহ সঁপে দিতে
ঘোরতর আপত্তি ছিল যার, কবির কথার ফাঁদে
ফেঁসে গিয়ে তার রাগ দ্রুত জল হয়ে যেতে থাকে।
তখন টেবিলে শায়িত সম্মোহিত রোগীর মতন
Like a patient etherised upon a table
মিল-অমিল, মল-মিল, মিল-অমিল...মিল
জপতে-জপতে-জপতে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ে।

কবির আসল খেলা শুরু হয় ঘুমের ভিতরে।

'না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে!
নহে গুরু উরুদ্বয়, বর্তুল কদলী–
সদৃশ! সে কটি, হায়, করপদ্মে ধরি
যাহায় নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ! সুধাহীন অধর, লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে!'

(দশরথের প্রতি কেকয়ী)

চক্ষুদান

একটি কাব্যনাটিকা

কবি — শুধু নারীগর্ভে জন্ম দিয়েই ক্ষান্ত হননি আমার ঈশ্বর।
নারীর সঙ্গে এমনভাবে তিনি গেঁথে দিয়েছেন আমাকে,
যে, নারীর পাশ থেকে আমাকে যদি সরিয়ে নেয়া হয়,
আমাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না, চেনা যায় না।
আমি অদৃশ্য অলীক-অবাস্তব-অবস্তুতে পরিণত হই।
অমানিশায় আবৃত আকাশ যেরকম স্পষ্ট হয় বজ্রচেরা
বিদ্যুতরেখায়, আমিও তেমনি নারী-বিদ্যুতে দৃশ্যমান।
নারীর মধ্যে আমি আমার নিয়তিকেই প্রত্যক্ষ করেছি।
আপাতদৃষ্টিতে আমাকে নারীপিপাসু বলে মনে হলেও,
প্রকৃতপ্রস্তাবে আমি ছিলাম বেদেনির হাতের গোক্ষুর।
নূহের নৌকায় যখন আশ্রয় খুঁজছিলো এ-পৃথিবী, তখন
আমি দুলেছিলাম সর্বগ্রাসী নাগিনীর হাতের দোলায়।
নারীর সামান্য স্পর্শে মূর্ছা গেছি বলে, আমার দাসীরা
এক-পর্যায়ে আমাকেই তাদের দাস বানিয়ে ছেড়েছে।
অন্যথায় আমি হয়তো কোনোদিন বুঝতে পারতাম না,
এতো শান্তি, এতো সুখ, এতো তৃপ্তি নারীর সেবায়।

বহু রমণীর সঙ্গেই আমি নানাভাবে সম্পর্কিত হয়েছি,
এবং তাদের বেশ ক'জনকে আমি বিবাহও করেছি।
কম ভালোবাসার কৌশল আমার আয়ত্বে ছিলো না;
ফলে, পত্নী, প্রেমিকা, দাসী ও গণিকাসকলের মধ্যে
আমি খুম মোটাদাগের পার্থক্য রচনা করতে পারিনি।
তবে, আমার পত্নীদের মধ্যে শর্মিষ্ঠাকে আমি একটু
বেশি ভালোবেসেছিলাম। আমার প্রিয়-নারীদের মধ্যে
শমিষ্ঠা ছিলো সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, সাহসী ও অহঙ্কারী।
আমি তাকেই আমার প্রধান স্ত্রীর মর্যাদা দান করি।

ভাবতে পারিনি, সেই শর্মিষ্ঠা আমাকে ত্যাগ করবে।
আমার বহুগামিতার কথা শর্মিষ্ঠার অজানা ছিলো না,
অন্যসূত্রের দরকার হয়নি, আমি নিজেই বলেছি।

শর্মিষ্ঠা চলে যাবার পর মনে হচ্ছে, আমি হয়তো
ভয় ভাঙাতে গিয়ে ভয় ধরিয়ে দিয়েছি তার মনে;
সংশয় দূর করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছি নতুন সংশয়।
আমার কাব্যের দোহাই দিয়ে আমি বলতে পারি,
শর্মিষ্ঠাকে ত্যাগ করার কথা আমি কদাচ ভাবিনি।
সে আমাকে ত্যাগ করেছে ভয়ে, সংশয়ে, দ্বিধায়।

যাবার সময় সে একটি ছোট চিরকুট
রেখে গেছে আমার জন্য।

শর্মিষ্ঠা তোমার আনন্দপথে আমি আর বাধা হতে চাই না।
আমি তোমাকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।
তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।
আমি জানি, তুমি তোমার অভ্যাসের কাছে বন্দি।
তাই করতলগত গোলাপে তুমি গন্ধ খুঁজে পাও না।
তোমার কামকে তৃপ্ত করার মতো ঐশ্বর্য আমার নেই।
আমি চাই তুমি এমন এক স্বপ্ন-রমণীকে খুঁজে পাই,
যার মধ্যে তোমার সকল দেহবাসনার অবসান হয়।

কবি শর্মিষ্ঠা চলে যাবার পর খুব একা লেগেছিলো।
মনে হয়েছিলো, বুক থেকে কী যেনো খসে পড়েছে।
আমি মর্ত্যলোকে ছেড়ে শূন্যলোকে উত্তিত হয়েছি।
সেখানে কামের আনন্দ নেই, রমণের তৃষ্ণা নেই,
জনমে আগ্রহ নেই; শূন্য, শুধু শূন্য সসাগরা।

শর্মিষ্ঠার রেখে-যাওয়া চিরকুটের আট-পঙ্‌ক্তির মধ্যে
আমি আমার খুব-ভেতরের আমিটিকে দেখতে পাই।
প্রত্যয় হয়, শর্মিষ্ঠা আমার সম্পর্কে যথার্থই বলেছে।
আমার প্রতি গভীর ভালোবাসাই যে তার অন্তর্ভেদী
পর্যবেক্ষণের উৎস, সে-কথা ভেবে, পলাতকার জন্য
অপরাধবোধের আবেগে আমার মন খুব চঞ্চল হয়।

আমার প্রিয় নারী-মুখগুলো আমার উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে
চকিত হায়াপাত করে দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

শয্যায় প্রতীক্ষারত দাসীর অপেক্ষা উপেক্ষা করে
আমি না-দেখা মায়ের মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করি।
কিন্তু বৃথা চেষ্টা, তাঁর মুখ আমার স্মরণে আসে না।
অতিক্রান্ত দিনের বেদনায় আমার মন পর্যুদস্ত হয়,
তখন খণ্ডিত মৃত্যুর মতো নিদ্রা আমাকে গ্রাস করে।

নিদ্রার মধ্যে আমি এক স্বপ্ন-রমণীর সন্ধান পাই।
শর্মিষ্ঠার অন্তর্ধানের অনুমিত সন্দেহ-সমূহের সঙ্গে
তখন আরও দুটো সম্ভাব্য সন্দেহ এসে যুক্ত হয়।
প্রথমত আমার মনে হতে থাকে, ঐ স্বপ্ন-রমণীর
অলক্ষ্য নির্দেশেই শর্মিষ্ঠা আমাকে ত্যাগ করেছে।
দ্বিতীয় সন্দেহ : নিয়তি-নির্ধারিত পরিণতি দিকে
আমার জীবনকে ধাবিত করার জন্যই হয়তো-বা
আমার জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে সে।

শর্মিষ্ঠার সঙ্গে ঐ স্বপ্নরমণীকে আমি মিলাতে চাই,
কিন্তু আলোকবর্তিকা থেকে বিচ্ছুরিত বর্ণ-তরঙ্গে
ঝলসে-যাওয়া চোখে নারীরূপ দৃশ্যমান হয় না।
তার কণ্ঠ-উচ্চারিত দৈবশব্দের তরঙ্গপ্রবাহ যখন
আমার ত্বক স্পর্শ করে, তখন বুঝি, রক্তপ্রবাহে
যৌনতার চাঞ্চল্য জাগিয়ে কাম-জাগানিয়া নারী
আমার স্পর্শের সীমার ভিতরেই প্রবেশ করেছে।
তার স্পর্শলাভের জন্য আমি হস্ত প্রসারিত করি,
কিছুতেই আমি তার কাছে পৌঁছুতে পারি না;
স্পর্শ করার আগেই সে অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়।
অগত্যা, আগন্তুকার কণ্ঠে উচ্চারিত আকাশবাণী
শ্রবণ করব বলে আমি বাতাসে কান পেতে থাকি।
আমি বুঝি, আমি দৈবআত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি।

অশরীরী শর্মিষ্ঠার জন্য দুঃখ করো না, মৃত্যুঞ্জয়, তুমি তাকে
ভুলে যাও। সে আর ফিরে আসবে না।

মৃত্যুঞ্জয় হে অশরীরী, কে তুমি? কী তোমার পরিচয়?
শর্মিষ্ঠা যে ফিরবে না, তা তুমি জানো কীভাবে?

অশরীরী জানি। তোমার জীবন ঘিরে যা-কিছুই ঘটেছে,
তার প্রায় সবকিছুই আমি জানি, মৃত্যুঞ্জয়।
শর্মিষ্ঠা তোমার বন্ধু প্রেমাংশুর প্রণয়ে আসক্ত।
তার গর্ভের ভ্রূণটিও তোমার নয়, প্রেমাংশুরই।
শর্মিষ্ঠা তার কাছেই গেছে। সে ফিরবে না।

মৃত্যুঞ্জয় প্রেমাংশুর প্রতি শর্মিষ্ঠার দুর্বলতা ছিলো, জানি,
কিন্তু তা এতো দূর? না, আমি বিশ্বাস করি না।
তুমি অযথাই বিভ্রান্ত করতে চাইছো আমাকে।

অশরীরী সত্য-বিচারে অবিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয় আচ্ছা, তুমি আমার নাম জানলে কী করে?

অশরীরী জানি, তোমার সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই জানি।
তোমার নারী-প্রীতির কথা কে না জানে এ-জগতে?
আমি জানি, নারীই তোমার সকল আনন্দের উৎস।
তোমার অনিষ্ট হচ্ছে নারী, নারী এবং নারী।

মৃত্যুঞ্জয় নারীর মুখে রহস্যময় কথা আমি এর আগেও শুনেছি।
কিন্তু তোমার মতো অন্তর্যামী-অশরীরী নারীর সন্ধান
আমি কখনও পাইনি। হে অন্তর্যামিনী, অঙ্গহীনা নারী,
তোমার কণ্ঠে আনন্দ শব্দটি বড়ো ভালো লাগলো।
তোমার ফাঁদে পা-বাড়াতে আমার খুবই ইচ্ছে করছে।
আমি শর্মিষ্ঠার জন্য এই রাতটিকে উৎসর্গ করেছিলাম,
ভেবেছিলাম, অন্তত এক রাত আমি নারীহীন কাটাবো,
তাই কামার্ত দাসীকে আমি দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিয়েছি।
তুমি আমার ঘুমিয়ে-পড়া-মিলন-তৃষ্ণা জাগ্রতা করেছো,
আমার নিদ্রাভঙ্গের শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে।
আমি তোমাকে আলিঙ্গন করবার আগ্রহ বোধ করছি।
শর্মিষ্ঠাকে নয়, আমি তোমাকেই চাই, শুধু তোমাকেই।

অশরীরী মানুষের তীব্র যৌন-আকাঙ্ক্ষার কাছে প্রতিদিন কতো
প্রতিজ্ঞা যে ভেসে যায়, সে আমি জানি, তুমিও জানো।
এ হচ্ছে বিধাতার দেয়া অনতিক্রম্য আনন্দের ব্যাধি।

মৃত্যুঞ্জয় শর্মিষ্ঠার স্মৃতির অনলে দগ্ধ ছিলো প্রাণ। তুমি তাকে
কথার প্রলেপে এতো দ্রুত মুছে দেবে, ভাবতে পারিনি।
আমি কামার্ত। হে অশরীরিণী, তুমি রূপ পরিগ্রহ করো,
তোমাকে মাঠার মতো মন্থন করার জন্য আমার বাহুবন্ধ
এখন বসন্তবায়ুহিল্লোলে কলমিলতার মতো কম্পমান।
তুমি কি আলিঙ্গন দানে তৃপ্ত করবে না আমাকে?

যার কণ্ঠস্বরে এতো মধু, না জানি তার দেহে কত সুধা!
জানি না, কোন দেবীর আদলে নির্মিত তোমার তনু?
না, না আমি আর একটি মুহূর্তও সইতে পারছি না।
তুমি প্রকাশিত হও, তুমি দেহযুক্ত হও, তুমি হও ...।

অশরীরী স্থির হও মৃত্যুঞ্জয়, আমাকে তুমি অবশ্য করে পাবে।
কামের নিগ্রহ থেকে আমিই তোমাকে মুক্ত করবো,
তার আগে তুমি আমার বিগ্রহ গড়ো। পারবে না?

মৃত্যুঞ্জয় এক অক্ষম পুরুষ আমি, হে নারী, আমি কি ঈশ্বর?
কাব্য আর কামকলা ছাড়া অন্য বিদ্যা আয়ত্ব করিনি।
আমি কীভাবে নির্মাণ করবো তোমাকে, বলে দাও।

অশরীরী ভালোবেসে। ঈশ্বর তো ভালোবেসেই এই বিশ্বলোক
নির্মাণ করেছেন। তুমি ভালোবাসলেই আমি হবো।

মৃত্যুঞ্জয় অন্তরাল থেকে কণ্ঠকামে আর বিদ্ধ করো না আমাকে।
ভালোবাসাই যদি নির্মাণের পূর্বশর্ত হয়, আমি রাজী।
হে মায়াবিনী, তুমি আমাকে ভালোবাসায় দীক্ষা দাও,
আমি এ-মুহূর্তে কামাতিরিক্ত এমনকিছু অনুভব করছি,
যার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো না, এ যদি ভালোবাসা,
তবে তুমিই আমার সে ভালোবাসাকে জাগ্রত করেছো।
হে প্রেমজাগানিয়া, তোমার অর্জন তো তোমারই প্রাপ্য।
তোমাকে ভালোবাসতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।
আমার খুব ইচ্ছে করছে, তোমাকে নাম ধরে ডাকি।
আচ্ছা, ডাকবার মতো তোমার কি কোনো নাম নেই?

অশরীরী একসময় আমার একটা নাম ছিলো, কিন্তু এখন নেই।
এখন আমি নামহীন, নাম-না-রাখা শিশুর মতোন।
তুমি আমাকে একটা সুন্দর নাম দাও না, মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয় সন্দেহ হচ্ছে, নারীর প্রতি আমাকে দুর্বল জেনে,
তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করতে আসোনি তো?

অশরীরী না, মৃত্যুঞ্জয় তুমি কবি তা জানি, কিন্তু আমি তো
স্বর্গের দেবী নই, আমি সামান্য এক মর্ত্যভ্রষ্ট নারী।
ছলনা কাকে বলে আমি কখনো শিখিনি, জানি না॥
জীবন দিয়ে যাকে পাইনি, ছল করে তাকে পাবো,
এমন দুরাশা তাই মনে পোষণ করিনি কোনোদিন।
তোমার সঙ্গে যদি কখনও ছলনা করি আমি, তবে
আরও হাজার বছর যেন আমার জন্মলাভ না হয়,
যেন আরও হাজার বছর আমি তোমাকে না পাই।

মৃত্যুঞ্জয় হে প্রেমজাগানিয়া নারী, এই কবির প্রতি তোমার
এরূপ অবিশ্বাস্য করুণার কারণ জানতে পারি কি?

অশরীরী করুণা বলো না। করুণা শব্দটি বুকে বড়ো লাগে।
এই শব্দটি আমার আবেগকেও প্রকাশ করে না।
আমার আবেগকে ভালোবাসা বলতে না চাও,
বলো আকর্ষণ, তবু করুণা নাম দিয়ে আমার
অপেক্ষাকাতর আবেগকে তুমি অপমান করো না,
মৃত্যুঞ্জয়, আমি কষ্ট পাবো। খুব কষ্ট পাবো।

মৃত্যুঞ্জয় তোমার নাম হতে পারে দুর্বলতা। নামটা পছন্দ হয়?

অশরীরী আমি তো আর আমাকে ডাকবো না, তুমিই ডাকবে।
নামটা নতুন। তোমার পছন্দ হলে আমারও পছন্দ।
কবির দেয়া নামের একটা আলাদা মূল্য তো আছেই।

মৃত্যুঞ্জয় দুর্বলতা, এবার নিশ্চয় তুমি তোমার পরিচয় বলবে।

অশরীরী কোনো অপ্রস্তুত মনের কাছে মনের কথা বলা যায় না।
আমাকে পুনরায় শ্রবণ করার জন্য তোমার মনে যে
প্রতীক্ষার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমি আশ্বস্ত হয়েছি।
অন্যথায় অভিনয় করার অভিযোগে তুমিই আমাকে
ভর্ৎসনা করতে, আমিও নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতাম।
এখন আমার আর বলতে কোনো দ্বিধা নেই, শোনো :

যাঁর অভিশাপে তোমার মধ্যে রুদ্রকাম প্রবেশ করেছে,
তিনি ছিলেন আমার পিতা, গণপতি।
আমি তাঁরই জ্যেষ্ঠা কন্যা।
মন্ত্রের মতো জপ করবেন বলে গণপতি আমার নাম
রেখেছিলেন, গায়ত্রী। ওটাই আমার পূর্বজন্মের নাম।

মৃত্যুঞ্জয় আমি আমার শ্রবণকে বিশ্বাস করতে পারছি না।
গা-য়-ত্রী? গায়ত্রী? গায়ত্রী, তুমি সেই, তুমিই সে-ই?
এই নাম দীর্ঘদিন আমারই তো জপমন্ত্র ছিলো,
আমিও কি এই নাম কম জপ করেছি জীবনে?
হায় দুর্বলতা, হ্যাঁ, তুমি গায়ত্রী হলেই ভালো।

গায়ত্রী ভয় ছিলো, তুমি বুঝি আমাকে ভুলে বসে আছো।
আজ আমাকে নির্ভয় করলে, মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয় শত-জীবনের বিনিময়ে একদিন যাকে প্রার্থনা করেছি,
তাকে বুঝি এতো সহজেই, এক-জীবনে ভোলা যায়?
ভুলে যাইনি, ইচ্ছে করেই ভুলেছিলাম তোমাকে।
এতোদিন পর, আজ কেনো তোমার নামের নেশা
জাগিয়ে দিলে আমার প্রাণে? কেনো গায়ত্রী? কেনো?
তোমাকে চিরমৃত জেনে, কী সুখেই না ছিলাম আমি।
আমার বিস্মরণের সুখ তোমার বুঝি সহ্য হলো না?

গায়ত্রী অস্থির হয়ো না, মৃত্যুঞ্জয়! আমি তোমার চিত্তসুখ
হরণ করতে আসিনি; আমি জানি, মদ কখনও
পানপাত্রকে নেশাগ্রস্ত করে না, করে প্রাণপাত্রকে।
পানপাত্রকেই নেশাগ্রস্ত করে, এমন অবস্থা থেকে
তোমাকে আমি মুক্ত করতে চাই, মৃত্যুঞ্জয়।

আমি জানি, তুমি ছিলে বহিরঙ্গের নেশায় উন্মত্ত,
তাই অন্তরঙ্গের আহ্বান তোমার হৃদয়ে পৌঁছায়নি।
তুমি কি জানো আমি তোমার প্রিয় ছিলাম কেনো?

মৃত্যুঞ্জয় না। আমি জানি, তোমাকে আমার চাওয়া হয়েছিল,
পাওয়া হয়নি। অন্ত্রনালীর গোপন ক্ষতের মতোন
ঐ যন্ত্রণার্ত বোধ আজও গেঁথে আছে আমার বুকে।
আমি কেন পেতে চেয়েছিলাম তোমাকে, জানি না।

কেনো পাওয়া হয়নি, তাও জানি না। শুধু এই জানি,
আমার কাছে তুমি আজও এক নিষিদ্ধ নেশার নাম।
এ-নেশার উৎস কোথায়, আমি জানি না, গায়ত্রী ...।

গায়ত্রী আমি জানি, মৃত্যুঞ্জয়, আমি জানি।
আমাকে অনুমতি দাও, শুরু করি।

মৃত্যুঞ্জয় বলো গায়ত্রী, বলো, দর্পণে নিজের মুখ দেখতে
আমি ভয় পাই না। ভূমিকার আর দরকার নেই,
তুমি বলে যাও, আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে শুনবো।
বিচারকের নির্মম রায় শোনার জন্য আমার মন
এখন অপরাধীর মতোন প্রস্তুত হয়েছে। বলে যাও ...

গায়ত্রী আষাঢ়ের এক বর্ষণমুখর দ্বিপ্রহরে, কামবশ হয়ে
আমার পিতা গণপতি, তোমার জননী শতরূপার
আহ্বানে এক দীর্ঘ বনসঙ্গমে মিলিত হয়েছিলেন।
ঐ বনসঙ্গম কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিলো না।
গণপতি তখন কুমার, শতরূপা বন্ধুপত্নী, পরস্ত্রী।
বোঝা যায়, শতরূপার আগ্রহ প্রবলতর না হলে
গণপতি-দ্বারা এই সঙ্গমায়োজন অসম্ভব হতো।
অগ্নির আহ্বানে ধাবমান পতঙ্গের মতো গণপতি
শতরূপার কামার্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।
বনসঙ্গম শেষে, সঙ্গমতৃপ্তা, আনন্দিতা শতরূপা
গণপতির ঘর্মক্লান্ত কপালে বিদায়-চুম্বন করেন।
ঠিক তখনি দৃশ্যপটে মহেশ্বরের আগমন ঘটে।
বিদায়-চুম্বনের দিকে তাকিয়ে, তার কিয়ৎপূর্বে
সম্পন্ন ঘটনাক্রম অনুধাবন করে মহেশ্বর তখন
ক্ষিপ্ত ব্যাধবৎ গণপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।
নুব্জমুখ গণপতি স্বেচ্ছায় সমরে পরাভূত হন।
মহেশ্বর পরাজিত বন্ধু গণপতির বাম-চক্ষুটিকে
উৎপাটিত করে শতরূপাকে উপহার দান করেন।
গণপতির উৎপাটিত চোখটিকে শতরূপা
গর্ভচ্ছিন্ন ভ্রূণবৎ কম্পিত করপুটে গ্রহণ করেন,
এবং আপন অশ্রুজলে ভিজিয়ে দিতে থাকেন।
পদদলিত পদ্মসদৃশ গণপতির রক্তক্ষরা চক্ষুটি
তার সঙ্গমসহযোগিনীকে শেষদর্শন দান করে
চির-অন্ধকারে নির্বাপিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয় নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! না, আমি বিশ্বাস করি না।
আমি আর শুনতে চাই না, গায়ত্রী।
তুমি থামো। তুমি যাও।

গায়ত্রী ছি! মৃত্যুঞ্জয়! তুমি কবি। তুমি না সত্যদ্রষ্টা?
সত্যশ্রবণে অনাগ্রহ তোমাকে মানায় না।
কবিকে কঠোর হতে হয়, নির্মোহ হতে হয়।

মৃত্যুঞ্জয় যখনই নারী আমার কষ্টের কারণ হয়েছে,
আকাশে চোখ তুলে আমি তোমাকে ভেবেছি।
তুমি তো আগে কখনও দেখা দাওনি আমাকে,
আজ কেনো স্বপ্নছলে আবির্ভূত হলে তবে?
আমার জনক মহেশ্বর কতোটা নিষ্ঠুর,
আমার জননী শতরূপা কতোটা কুলটা,
আর তোমার জনক গণপতি কতো নিষ্কলুষ,
এই কল্পতথ্য আমাকে জানাতে?

গায়ত্রী মৃত্যুঞ্জয়, তোমার মন এখনও স্পর্শকাতর,
সমাজের দেয়া নীতিশিক্ষার আঁধারে আবৃত।
কাউকে দোষারূপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।
পক্ষ নেয় জীবিত মানুষ, আমি কোনো নেবো?
সময় সতত সত্য। তার পূর্বাপর কিছু নেই।
গণপতি আর মহেশ্বর সময়ের অভিন্ন সন্তান।

রুদ্র-যৌন-কামনার কাছে মানুষ যে অসহায়,
তোমার মতোই আমিও তা ভালো করে জানি।
শর্মিষ্ঠা চলে যাবার পর, তোমার নারী-তৃষ্ণা
এ-মুহূর্তে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।
এ-কারণেই, তোমার কাছে আমার আত্মাকে
অনাবৃত করার জন্য আমি এই রজনীটিকে
বেছে নিয়েছি। আমি এর অপেক্ষায় ছিলাম।

মৃত্যুঞ্জয় আমি জন্মে বড়ো হলেও, মৃত্যুতে তুমিই বড়ো।
সম্পর্ক-সীমা থেকে মৃত্যু তোমাকে মুক্ত করেছে।
জাগতিক অভ্যাসবশত, জনক-জননীকে আমি
আজও মুগ্ধ শ্রদ্ধার চোখে দেখি, তাই উষা।

লজ্জা দিও না, আমাকে ক্ষমা করো, গায়ত্রী।
কালো গোবরে শাদাকড়ির মতো আমি আজ
তোমার আত্মায় আমার আত্মাকে স্থাপন করেছি।
বলে যাও, যতো কষ্টেরই হোক আমি শুনবো।

গায়ত্রী চক্ষু হারানোর যন্ত্রণা ও বন্ধুবিচ্ছেদের অন্তর্জ্বালা
বুকে নিয়ে, অসহায় গণপতি বনমধ্যে দাঁড়িয়ে,
বৃক্ষরাজি সাক্ষী রেখে মহেশ্বরকে অভিশাপ দেন।

মহেশ্বরের প্রতি গণপতির অভিশাপ।
গণপতির কণ্ঠে।

হে স্ত্রীগর্বিত বান্ধব, কামবশ হয়ে আজ যে-কাজ
আমি করেছি, এমন গুরুদণ্ড তার প্রাপ্য ছিল না।
শতরূপার আহ্বানে সাড়া দিয়েই আমি তাঁর সঙ্গে
সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, এজন্য তোমার সম্মতির
প্রয়োজন আছে বলে আমার কখনও মনে হয়নি।
আমি ভেবেছিলাম, তুমি তোমার পূর্ব-প্রপিতামহ
ঋষি উদ্দালকের মতো স্ত্রীর স্বাধীন-সত্তায় বিশ্বাসী।
নির্জন বনের ভিতরে আমার চক্ষু উৎপাটন করে
তুমি আজ আমার চেয়েও বেশি অপরাধ করলে।

তুমি কেমন করে ভুলে গেলে তোমার অতীত?
শতরূপার রূপে মুগ্ধ হয়ে, যে-রাতে তুমি তাকে
পিতৃগৃহ থেকে অপহরণ করো, জীবন বাজি রেখে
সেদিন আমিই তো তোমার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম।
আমিও যে অগ্নিস্বরূপা শতরূপার রূপের অগ্নিতে
দগ্ধ হতে পারি, আমিও যে তোমার মতোই মদন
ঠাকুরের বাণে বিদ্ধ রক্তমাংসে গড়া কামের অধীন
এক তৃষিত-পুরুষ; লুণ্ঠিত নারীর ওপর একচ্ছত্র
অধিকার প্রতিষ্ঠার লোভে, তাকে বিবাহ-রজ্জুতে
বেঁধে কী কৌশলেই না দূরে ঠেলে দিলে আমাকে।

এই স্বাভাবিক সঙ্গমের প্রতি মানবিক সহানুভূতি
প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়ে আমাদের দু'জনের প্রতি তুমি
আজ যে নিষ্ঠুর আচরণ করলে, সে-জন্য আমি
কামদেবের পক্ষ হয়ে তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি :

ভবিষ্যৎ তুমি যদি কোনো পুত্র লাভ করো
সে হবে কবি এবং কামুক। রুদ্ররূপী কামদেব
তোমার ঐ পুত্রের নিয়তি নিয়ে খেলা করবেন;
শত-নারীতেও তার আনন্দের নিবৃত্তি হবে না।
সে ভেসে বেড়াবে শৈবালের মতো, তার
মন থিতু হবে না কোথাও, কিন্তু তোমার মন
অদম্য অপত্যস্নেহে সিক্ত হবে, যাতে তোমার
পুত্রদত্ত প্রতিটি কষ্ট তোমার অন্তরকে নিরন্তর
বেদনায় বিদ্ধ করে, ধৌত করে ও শুদ্ধ করে।

গায়ত্রী মৃত্যুঞ্জয়, তুমিই সেই অভিশপ্ত কবি ও কামুক।
গণপতি প্রদত্ত অভিশাপের পর বছর না ফুরাতেই
শতরূপা তোমাকে প্রসব করেন।

মৃত্যুঞ্জয় একটু থামো গায়ত্রী। আমাকে ভাবতে দাও।
আমি কার পুত্র তবে, মহেশ্বর নাকি গণপতির?
আমি কি ঐ বনসঙ্গমজাত গণপতির সন্তান?
কার পুত্র আমি? কে আমার প্রকৃত জনক?

গায়ত্রী ওটা এমনকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়, মৃত্যুঞ্জয়।
এই মহা-প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে দেখো,
মানুষের মতো আত্মস্বার্থমগ্ন প্রাণীর সন্ধান
তুমি একটিও খুঁজে পাবে না এ বিশ্বলোকে।
জন্মের স্বতঃস্ফূর্ত অসীমত্ব প্রকাশের পথে
বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে মনুষ্যসমাজ।
স্বার্থমগ্ন সামাজিক শর্তের পাথরে আজ তাই
ঢাকা পড়ে গেছে মানুষের জন্মের গৌরব।
মৃত্যুঞ্জয়, তুমিও কি এ-সমাজ মানো?

মৃত্যুঞ্জয় না, গায়ত্রী, মানি না। আমিও প্লেটোর শিষ্য।
তবু, কৌতূহল বশতই জানতে ইচ্ছে করছে—
কে আমার জনক? মহেশ্বর নাকি গণপতি?

গায়ত্রী হয়তো জানতেন শতরূপা, কে সেই পুরুষ,
যার বীর্যের আহ্বানে খুলেছিলো তাঁর গর্ভদ্বার।
কিন্তু, শতরূপা তোমার জন্মের উৎস প্রকাশের
ভার এই মহাপ্রকৃতির হাতে ন্যস্ত করে যান।

তোমার জন্ম-ইতিহাস অস্পষ্ট রহস্য-জালে
চিরদিন আবৃত থাকুক; শতরূপা হয়তো-বা
এমনটিই চেয়েছিলেন। আমি ঠিক জানি না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্রমূর্তি স্বামী, সন্দিহান মহেশ্বর, বন্ধুর চোখ
যিনি উৎপাটন করেন অবলীলায়—, তার পক্ষে
ভ্রূণঘ্ন হওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক, তিনি তো
মাতৃগর্ভেই বিনষ্ট করতে পারতেন আমাকে।
তাঁর জন্য তা কি খুব অসম্ভব ছিলো?

গায়ত্রী হ্যাঁ, অসম্ভবই ছিলো। তিনি চেষ্টা করেছিলেন,
কিন্তু শতরূপাকে রাজি করাতে পারেননি।

মৃত্যুঞ্জয় সেক্ষেত্রে তিনি শতরূপাকে ত্যাগ করতে পারতেন,
পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন আমাকে।
অথচ তিনি এসব কিছুই করেননি। তুমি তাঁকে
নিষ্ঠুর-পুরুষরূপে চিত্রিত করছো কোন্ যুক্তিতে?
তাঁর চেয়ে গণপতি, এক অনাগত নিষ্পাপ শিশু
যার অভিশাপের নির্মম-শিকার, তিনিই তো
অধিক নিষ্ঠুর আমার বিচারে, বলো সত্য কি না?

গায়ত্রী হ্যাঁ, সত্য। খুব সত্য। নিষ্ঠুর গণপতিও কম নন।
তবে লোভের বিরুদ্ধে লোভ, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা,
ক্রোধের বিরদ্ধে ক্রোধ; তুলনায় কম অপরাধ।

মৃত্যুঞ্জয় ক্রোধবসানে, অনুশোচনায় দগ্ধ হননি মহেশ্বর?

গায়ত্রী হ্যাঁ, হয়েছিলেন। সে এক ভিন্ন মহেশ্বর।
যেনো ঘূর্ণিঝড়ের পরের শান্ত আকাশ।
গণপতির মণিশূন্য চোখের দিকে তাকিয়ে
কৃতকর্মের অনুতাপে তিনি দগ্ধ হন।
শতরূপার ঘৃণাকুঞ্চিত মুখ দর্শন করে
তাঁর মন অনুশোচনায় দ্রব হয়।
তিনি অনুভব করেন, রিপুসমূহের মধ্যে
কামের চাইতে লোভই হচ্ছে অধিক নিষ্ঠুর।
কাম নয়, জগতে ক্রোধই হচ্ছে পাপের উৎস,
লোভই পাপের উৎস, হিংসাই পাপের উৎস।

মহেশ্বরের ক্রোধ দ্রুত মৃত্তিকায় পরিণত হয়,
এবং উপলব্ধির এক-পর্যায়ে গণপতির সঙ্গে
তাঁর অস্তিত্বের ভেদরেখাটি অদৃশ্য হয়। তাই
অনাকাঙ্ক্ষিত অপুত্রজ্ঞানে পরিত্যাগ না করে,
মহেশ্বর তোমাকে পুত্রজ্ঞানে বুকে তুলে নেন।

মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর হলে, গণপতির চক্ষু হরণের পাপ থেকে,
জানো গায়ত্রী, মহেশ্বরকে আমি মুক্তি দিতাম।
অপর ঔরসজাত সন্তানকেও আপন সন্তানজ্ঞানে
যিনি বুকে তুলে নিতে পারেন, তিনি তো ঈশ্বর।

গায়ত্রী হ্যাঁ, তোমাকে ভালোবেসে তিনি পাপমুক্ত হন।

মৃত্যুঞ্জয় আমার মায়ের জন্যও ঐ দিনটি নিশ্চয়ই খুবই
আনন্দের দিন ছিলো, গায়ত্রী। তাই না?

গায়ত্রী হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু ঐ আনন্দকে ভোগ করার
ভাগ্য ছিলো না তাঁর। গর্ভযুদ্ধে ক্লান্ত শতরূপা
তোমার জন্মের পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন।
নানা কালব্যাধি তাকে আক্রমণ করে এবং
কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লোকান্তরিত হন।
তুমি অকালে মাতৃহীন হও। বিভিন্ন রমণীর
স্তন্য পান করে তোমার দিন কাটে।

মৃত্যুঞ্জয় তারপর?

গায়ত্রী কিছুদিনের মধ্যেই মহেশ্বর আবার বিবাহ করেন।
তুমি এক নতুন মা লাভ করো। ঐ নতুন মা ও
মহেশ্বরের স্নেহচ্ছায়ায় শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে
যৌবন প্রাপ্ত হলে, তোমার ভিতরে রুদ্ররূপে
কামদেব প্রবেশ করেন। তখন মদন বাণে বিদ্ধ
যৌন-কামনার লকলকে শিখার আগুনে তোমার
চারপাশের সবুজপল্লবরাজি ঝলসে যেতে থাকে।
তুমি অগ্নি হয়ে ওঠো। অগ্নির অস্পৃশ্য কোন্ জন্য

মৃত্যুঞ্জয় আমার কী দোষ, গায়ত্রী? আমি লোভের সন্তান।
লোভপুত্র ক্রোধ কি ভগ্নি হিংসাকে বিবাহ করেনি?
ইতোমধ্যে সে অগম্য হয়েছে, আমি জানতাম না।

গায়ত্রী না, আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না মৃত্যুঞ্জয়।
আমার বিচারে তুমি ছিলে দেবশিশু, আজও তাই।
তোমার ভিতরে স্তব্ধ হয়ে আছে শান্ত মহাকাল।
রক্তে, স্মৃতির ভিতরে মহাকালকে যে ধারণ করে,
সমকালের ফাঁদে সে তার পা বাড়াবে কেনো?

গণপতি-বর্ণিত প্রকৃতি যখন ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছিলো
তোমার ভিতরে, তখন পুত্র-অন্ধ পিতা, মহেশ্বর
গৌতমের পিতার মতো বিবাহবন্ধনে বেঁধে
তোমাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।
কিন্তু তার প্রয়াসসমূহ ক্রমাগত ব্যর্থ হতে থাকে।
অনিবৃত্ত তৃষ্ণার অগ্নিতে তুমি দগ্ধ হতে থাকো।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি কেমন করে জানলে এসব কথা?

গায়ত্রী শতরূপার অনুরোধে, চিরকুমার ব্রত ত্যাগ করে,
স্বামী-পরিত্যক্তা এক নিঃসন্তান রূপসী-শুদ্রাণীকে
বিবাহ করেছিলেন গণপতি। তাঁর নাম অন্নপূর্ণা।
আমি তাঁর গর্ভজাত পঞ্চকন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা।
আমার মায়ের মুখেই আমি এসব কথা শুনেছি।
আমার মা'র কথা তোমার মনে পড়ে, মৃত্যুঞ্জয়?

মৃত্যুঞ্জয় তোমার মা? তোমার মা, অন্নপূর্ণা? মনে আছে।
মনে আছে গায়ত্রী, আমার সব, সব মনে আছে।
ছল করে আমি কতোবার তোমাদের বাড়ি ঢুকেছি।
আমার গন্ধ পেয়ে আদুরে কুকুরছানার মতো
লাফাতে-লাফাতে তুমি ছুটে আসতে আর
আমি শিবের মতোন আমাকে বিছিয়ে দিতাম
তোমার ছোট্ট নরম পায়ের তলায়।
আমি কি ভুল বলছি?

গায়ত্রী একটু ভুল বললে।

মৃত্যুঞ্জয় কেমন?

গায়ত্রী তোমার পায়ের শব্দ শুনে আমি ছুটে আসতাম ঠিকই,
তাই বলে কুকুরছানার মতো 'লাফাতে-লাফাতে' নয়।
মা বলতেন, মৃত্যুঞ্জয়ের পায়ের সঙ্গে তুই বুঝি তোর
কান দুটো বেঁধে দিয়েছিস? কথাটা মিথ্যে ছিলো না।

মৃত্যুঞ্জয় তোমার মতো প্রতিমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন বলে,
তোমাকে উৎসস্থল থেকে স্পর্শ করার আশায়,
আমি কতোবার যে কল্পনায় তোমার মায়ের গর্ভে
প্রবেশ করেছি, তা তুমি জানো না, তোমার মা-ও না।

গায়ত্রী আমার মা চাইতেন আমি তোমার দিকে ধাবিত হই।
কিন্তু গণপতি চাইতেন না আমি তোমার সঙ্গে মিলি।
তাঁর সন্দেহ ছিলো, কী জানি, তুমি যদি তাঁরই সন্তান
হয়ে থাকো, তবে তো আমরা দু'জন ভাই-বোন।
আমাদের মধ্যে সঙ্গম সম্ভব হলেও, বিবাহ নয়।

আমার বয়স তখন কম, বড়োজোড় আট/নয় হবে।
স্তনের বোঁটায় সবে কালো-গুটি বাঁধতে শুরু করেছে,
তার চারপাশের চামড়ায় যুক্ত হচ্ছে লাবণ্যের দ্যুতি।
আমার রমণীদেহটি পুরুষদেহের প্রয়োজন
মিটানোর জন্য তখনও প্রস্তুতি হয়নি।
কিন্তু কন্যার দেহ প্রস্তুত না হলে কী হবে,
দরিদ্র গণপতি তিনটি সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একদিন
আমাকে এক ধনীর অথর্ব পুত্রের হাতে তুলে দেন।

মৃত্যুঞ্জয় পরের ঘটনা আমি জানি, তোমাকে বলতে আর হবে না।
তোমার বিরহ, গায়ত্রী, আমার চাইতে বেশি
কে সহ্য করেছে এই পৃথিবীতে? তুমি শুধু বলো,
তোমার মৃত্যু, তা-কি স্বাভাবিক মৃত্যু ছিলো না?
আমি জানতাম, তুমি স্বামীর সংসারে সুখী হয়েছো।
আমি শুনেছিলাম, তুমি সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে ...!

গায়ত্রী না, মৃত্যুঞ্জয়, তুমি ভুল শুনেছো। মুহূর্তের জন্যও
স্বামীকে আমি প্রার্থিত-পুরুষ বলে ভাবতে পারিনি।
অথচ তার হাতেই যখন আমি ফুটতে শুরু করলাম,
তখন খুব ছোটোবেলা থেকে দেখা তোমার জন্মের
এক সর্বনাশা অর্থ আবিষ্কৃত হলো আমার কাছে।

আমান মন চঞ্চল হলো তোমাকে দেখার জন্য,
তোমাকে ছোঁয়ার জন্য, তোমাকে পাওয়ার জন্য।
তোমাকেই আমি পরমপুরুষ ভাবতে শুরু করলাম।
আমার মনের ত্রিশংকু অবস্থা আঁচ করতে পেরে
আমার পিতা আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন :

গণপতি আমার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, গায়ত্রী।
আমি কেনো আমার এক চক্ষু হারিয়েছি, জানো?
পর-পুরুষ যদি তোমার পরমপুরুষও হয়, তবু
তার দিকে মন বাড়িও না। মন বাঁধো। শান্ত হও।

মৃত্যুঞ্জয় পিতার কথা তুমি শুনলে না কেনো, গায়ত্রী?
আমি তো পিতার কথায় একাধিক বিবাহ করেছি।
সর্বনাশ অনিবার্য জেনেও, তুমি আমার দিকেই
কেনো নিক্ষেপ করলে নিজেকে?

গায়ত্রী আমি চেষ্টা করেছি, মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু পারিনি।
হয়তো আমার ওপর শতরূপা ভর করেছিলেন।
তাই প্রবল ইচ্ছার কাছে দুর্বল মন পরাভূত হয়।
তোমার দিকে ছুটে-যাওয়া মনকে কিছুতেই
আমি ফিরিয়ে আনতে পারিনি আমার কাছে।
আমার আত্মা আমার দেহকে বিদ্রূপ করে,
নিজেকে এক নিরর্থ-পুতুল বলে ভ্রম হয়।
আমি টের পাই আমার বন্ধন, আমার শৃঙ্খল।

এক-পর্যায়ে জীবন-যাতনা দেহকে পেরিয়ে
যখন আমার আত্মাকে স্পর্শ করতে উদ্যত হয়;
তখন কৃষ্ণপক্ষের এক অন্ধকার রাতে
আমি যোগীশাসনের অভয়রাণ্যে প্রবেশ করি।
অন্ধকারের সর্ব অর্গল খুলে দিয়ে পৃথিবী তখন
মর্ত্যভূমিতে তার শেষ-শয্যা বিছানোয় ব্যস্ত।
জোনাকিরা তাদের দেহকে প্রদীপে জ্বালিয়ে
আমাকে গভীরতম অন্ধকারের পথ দেখায়।
পত্রমর্মরে আমি শতরূপার ডাক শুনতে পাই।
পরিবর্তিত পৃথিবীর প্রয়োজন মিটানোর জন্য
তেঁতুলবৃক্ষশাখায় উদ্বন্ধনে আত্মনাশ ক'রে
তখন নিজেকে আমি পুনর্বিন্যাস করি।

শুরু হয় তোমার জন্য আমার অপেক্ষায় দিন।
বিশ্বাস ছিলো, একদিন অপেক্ষার অবসান হবে,
একদিন আমাকে তুমি মৃত্যুর মতো চাইবে।

[মৃত্যুঞ্জয়ের চাপাকান্নার আওয়াজ শোনা যাবে।]

মৃত্যুঞ্জয়, তুমি কাঁদছো? কাঁদো। কাঁদো।
দীর্ঘ-প্রতীক্ষার শেষে, আজ আমার আনন্দ।

মৃত্যুঞ্জয় হ্যাঁ, গায়ত্রী। আজ আমাদের মিলন হবে।
মেঘের কালো মাংসচেরা দুরন্ত বজ্রের মতো
আমি আজ তোমার ভিতরে প্রবেশ করবো।
আকাশ-মাটির মাঝে শূন্যতাকে অশ্রুজলে
মিশিয়ে দেবার জন্যই আজ এ ঝড় বইছে।
তোমার অতৃপ্ত হিয়ার মাঝে আমার হিয়াকে
বিছিয়ে দিয়ে আজ আমাদের হিয়া জুড়াবে।

ভালোবাসার এঁটেল মাটি ও যৌনকামনার খড় দিয়ে
এতোদিন ধরে যে-দেবীমূর্তি আমি নির্মাণ করেছিলাম,
তার অপ্রাণ দেহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হবে আজ।

হে অনন্তযৌবন জপমন্ত্র,
হে গণপতি-কন্যা,
আষাঢ়ী-পূর্ণিমার এই মঙ্গলরজনীতে
বেদমন্ত্র পাঠ করে,
সনাতন ধর্মমতে জ্যোতিঃসম্পাদনপূর্বক,
তোমার মণিশূন্য চোখে আমি আজ চক্ষুদান করবো।

গায়ত্রী এসো ...।

[মঞ্চের পশ্চাতে রাখা ধবধবে শাদাকাপড়ে নির্মিত পর্দায় একটি অনাবৃত রমণীর ছায়ামূর্তি ক্রমশ ফুটে উঠবে। ঐ ছায়ামূর্তিকে আলিঙ্গনে বন্দি করার জন্য মৃত্যুঞ্জয় পর্দার দিকে ছুটে যাবে। মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ যখন বস্ত্র হয়ে ঐ ছায়া-মূর্তিটিকে আবৃত করবে, মঞ্চের আলো নিভে আসবে ও যুগল ছায়ামূর্তি ক্রমশ অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে।]

কতিপয় সহায়ক টীকাভাষ্য

শতরূপা : প্রথম নারী। এক বর্ণনা হিসাবে ইনি ব্রহ্মার কন্যা; ব্রহ্মা স্বীয়কন্যার সহিত মিলিত হন এবং প্রথম মনু সায়ম্ভুবের জন্ম দান করেন। অন্য বর্ণনায় আছে, ইনি ব্রহ্মার স্ত্রী, কিন্তু মনুর মাতা নন। মনুর বিবরণ হিসাবে ব্রহ্মা নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করেন–নর ও নারী (শতরূপা)। এদের সঙ্গমে মনুর জন্ম হয়। পুত্র স্বায়ম্ভুর মনু হতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং কাকুতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

গণপতি : গণেশ।

মহেশ্বর : মহাদেব একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করেছিলেন। তাই তাঁকে একাদশতনু বা একাদশ রুদ্র বলা হয়। একাদশ রুদ্র : অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর।

মৃত্যুঞ্জয় : শিব। মহাদেবের অন্য নাম রুদ্র বা মহাকার, কারণ তিনি সর্বসংহারক। কিন্তু এই সংহার হতেই আবার তাঁর অভ্যুদয় হয়। সে জন্য শিব বা শংকর নামে তিনি জননশক্তি। মহাদেবের শিবরূপের এক নাম মৃত্যুঞ্জয়।

গায়ত্রী : ঋগ্বেদের পবিত্রতম মন্ত্র। দ্বিজগণের উপাস্য বৈদিক মন্ত্রবিশেষ।

'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎসবির্তুরেণ্যং ভর্গোদেবস্য
ধীমহি ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।'

শ্লোকটি সূর্যের উদ্দেশ্যে লিখিত। গায়ত্রী পাঠে মানুষ পরিত্রাণ পায়। গায়ত্রীর শক্তিতে ক্ষত্রিয় বিশ্বমিত্র ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন।

ঋষি উদ্দালক : একজন বিখ্যাত ঋষি। এঁর প্রকৃত নাম আরুণি। ইনি গুরু আয়াদধৌমের বরে উদ্দালক নামে খ্যাত হন। এঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদিন শ্বেতকেতু পিতামাতার নিকট উপবিষ্ট থাকার সময়ে এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁর পিতার সমক্ষেই তাঁর মাতাকে যৌন-আবেদন জানায় এবং সঙ্গমার্থে বলপূর্বক মাতাকে নিয়ে যায়। শ্বেতকেতু এতে ক্রুদ্ধ হওয়ায় উদ্দালক তাকে ক্রোধ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন ; 'সকল স্ত্রীই গাভীদের মত স্বাধীন। সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তাদের ধর্ম নষ্ট হয় না–ইহাই সনাতন ধর্ম।' শ্বেতকেতু পিতার সঙ্গে একমত হতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে মনুষ্যসমাজে বলপূর্বক এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, আজ হতে যে স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্গ করবে, যে পুরুষ ব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রী পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হবে, এবং পতি-আজ্ঞা পেয়েও যে স্ত্রী ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনে আপত্তি করবে, তারা সকলেই ভ্রূণ-হত্যা পাপে লিপ্ত হবে।

ক্রোধ : লোভের পুত্র। ইনি নিজের ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাদের একপুত্র ও এক কন্যা সন্তান হয়। পুত্রের নাম কলি ও কন্যার নাম দুরুক্তি।

[দ্র: *পৌরাণিক অভিধান* : সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত।]